[illegible] বর্ষ January to March, 1930. [illegible] সংখ্যা



খুলনা বি, কে, ইউনিয়ন স্কুলের মুখপত্র

President -

Woopendra Nath Chatterjee, B.A. B.T.
Headmaster.

Editor-in-chief -

Akshoy Kumar Roy choudhury.

PALLICHITRA
PRESS
BAGERHAT.

CONTENTS.

আরাধনা

—:❀:—

৬ষ্ঠ বর্ষ ||| JANUARY TO MARCH ||| ১ম সংখ্যা

"মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী"

(কাব্যতীর্থোপনাম্না শ্রীমদ্গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেবশর্ম্মনাবিরচিতেয়ং বন্দনা)

বীণা তানৈনরাণাং, চিরযুগবিততাং, নাশয়ন্তী প্রসুপ্তিম্,
হংসারূঢ়া শরণ্যা, কবিগণ-নিলয়া, জ্ঞানদা শুভ্রকান্তিঃ।
যা বাণী নিত্যশুক্লা, সুরগণ নমিতা, বাঙ্ময়ী হাস্যযুক্তা,
সর্ব্বে ছাত্রা মিলিত্বা, সিতকুসুমদলৈঃ পূজয়ামো বয়ং তাম্ ॥

—:❀:—

অবসান মাঘী শুক্লা চতুর্থীর নিশা
বালার্ক-সিন্দুর শিরে বিনোদিনী উসা
অধরে মধুর হাসি ধীরে ধীরে পরকাশি
সাজায়ে জলদ অঙ্গ বিবিধ বরণে
ভারতীর আগমন—কহে জগজনে ॥

(২)

প্রকৃতির কলাবৎ—বিহঙ্গমগণ
কাকলীতে সে বারতা করিছে ঘোষণ ;
অলি গুণ গুণ গুণ স্বনে জানায় জগত জনে
কুল্ কুল্ কুল্ রবে চলিছে তটিনী
কহিতে বারীশে আজি সে সুখ কাহিনী।

(৩)

বিকচ কুসুম-কুল প্রভাত সমীরে
হরিষে সে সমাচার কহে ধীরে ধীরে ;
সে সংবাদ শব্দবহ প্রসূন-সুরভি সহ
বিলাইছে জনে জনে মনের হরিষে
বিনত বিটপীবৃন্দ প্রেমাশ্রু বরিষে ।

(৪)

বাসন্তী সুষমারাজি বিভূষিতা ধরা,
ভারতীর আগমনে আর(ও) মনোহরা ;
জীব জন্তু চারিপাশে, সুখের সাগরে ভাসে,
লোকালয়ে নরগণ আনন্দ প্রকাশে
বৎসরান্তে মাতৃ-পদ দরশন আশে ॥

(৫)

এস গো এস গো মাতঃ ত্রিতাপ হারিনি !
তনয় বৎসলে দেবি ! জ্ঞান-বিধায়িনি !
হৃদয় কমলাসনে এস মা কমলাসনে ।
ভিতিয়ে নয়ননীরে দেই পদতলে
ভক্তি মলয়জ মাখা প্রীতি-পুষ্প দলে ॥

(৬)

অধম সন্তান বলি মনে নাহি পড়ে,
এলি কি মা তাই তুই বৎসরের পরে,
ভাবিবি না ছেলে বলে, পুনরায় যাবি চলে,
পাষাণি জননি ! থাকি দুই দিন হেথা
এই কি মায়ের কাজ এই কি মমতা ?

(৭)

সহি'ছি অনন্ত দুঃখ এ ক্ষুদ্র জীবনে
দহিছে সতত হিয়া ত্রিতাপ দহনে

দয়াময়ী যার নাম   সে কেন তনয়ে বাম
পাপতাপ নাশি দয়া কর দীন-জনে ;
কৃপাসিন্ধু ফুরাবে না বিন্দু বিতরণে ॥

(৮)

পূর্ণ হয় মনস্কাম সেবয়ে যে জন,
একচিত্তে দয়াময়ি ! তোমার চরণ,
পদযুগ হৃদে রাখি   তাই সদা তোমা ডাকি
হবে কি মা অধমের সফল কামনা,
লভিতে পারিব কি মা ভবে কীর্ত্তি-কণা ?

(৯)

অভয় চরণ ছায়া দিয়াছ মা যারে
ধরা ধন্য হয় সেই সবে পূজে তারে ;
নর হয়ে সেই জন   লভে অমরতা-ধন,
কালেতে ভৌতিক দেহ হয় তার নাশ
কীর্ত্তি-দেহ থাকে কিন্তু সদা সুপ্রকাশ ॥

(১০)

দয়াময়ি ! দুঃখ হরে ! ঈপ্সিতদায়িনি !
কাতর-কিঙ্কর পদে প্রণমে জননি !
কৃপাময়ি ! কৃপা করি,   মানস তিমির হরি,
দাও বিদ্যাধন ; পদে সঁপেছি মা চিত,
প্রসীদ গোপেন্দ্র-সুতে বিমাতৃ * লাঞ্ছিত ॥

(১১)

মাঘের বিংশতি দিনে   শ্রীপঞ্চমী বিদ্যমানে
দিয়া মোরা পুষ্পাঞ্জলি বাণীর চরণে
করিতেছি নিবেদন   কৃপা করি সুধীগণ
করিবেন পদার্পণ বি, কে, ইউনিয়নে ॥

---

* লক্ষ্মী

নদীতে বিপদ।

[শ্রীঅনিলভূষণ মুখোপাধ্যায়—৫ম শ্রেণী।]

সে আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের রজনী। একখানি নৌকা জনকতক আরোহী লইয়া মেঘনা নদী দিয়া যাইতেছিল। আরোহী-দিগের মধ্যে দুইজন পালোয়ান ছিল। উভয়ে লাঠি খেলায় বিশেষ পারদর্শী। শোনা যায়, তাহারা দুই জন নাকি একদা ৫০০ শত লোককে লাঠি দ্বারা পরাজিত করিয়া-ছিল। আকাশ নির্ম্মল, কোথায়ও একটু খানি মেঘ নাই। হঠাৎ মাঝিদের মধ্যে এক জন অপরকে বলিল, "ভাই একখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে।" অপরজন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ক্রমে ক্রমে ঐ মেঘখণ্ড সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলিল। ভীষণ হুঙ্কারে মেঘনা কাঁপিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উত্থিত হইতে লাগিল ও ভয়ানক ঝড় তাহার সহায় হইয়া মেঘনাকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছিল। আরোহীদের মধ্যে একজন বলিল "মাঝি, গতিক ভাল বোধ হইতেছে না। শীঘ্র নৌকা কূলে লাগাও।" মাঝি কহিল "বাবু এস্থানে ডাকাতের আড্ডা, নৌকা লাগাইতে আমার সাহস হইতেছে না।" নদীর সে ভীষণ অবস্থা দেখিয়া সকলেই সমস্বরে বলিল "শীঘ্রই নৌকা কূলে নাও। ডাকাতের ভয় করিলে শীঘ্রই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে।" সুতরাং তখনই নৌকার গতি কূলের অভিমুখী হইল এবং তীরস্থ একটী বৃক্ষে নৌকাখানা বাঁধিয়া তাহারা জিনিষপত্র সঙ্গে করিয়া তখনই কূলে উপস্থিত হইল। নৌকাখানা একবার কূলে আসিয়া উঠিতেছে এবং পুনরায় নদীর মধ্যে নামিতেছে। এইরূপে তিন ঘণ্টা অতীত হইল। নদীর অবস্থা কিছু প্রশমিত হইল এবং আরোহীরা পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিয়া তাহাদের গন্তব্য পথে নৌকা চালনা করিল। আরোহীদের একজন বলিল "মাঝি, মেঘনা অতিক্রম করিতে আর কত দূর বাকী, ডাকা-তের ভয় আর কতদূর পর্য্যন্ত আছে।" মাঝিদের সকলেই ডাকাতের অনুচর, তাহারা বলিল এখনও বাকী আছে। কিছুক্ষণ পরে একজন মাঝি উচ্চৈঃস্বরে একটা বাঁশীর আওয়াজ করিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানি সরু নৌকা তাহাদের পাশদিয়া

সন্ সন্ বেগে চলিয়া গেল। আরোহীরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মাঝিকে বলিল, "মাঝি এ নৌকা কাদের? ডাকাতের নয় ত?" মাঝি বলিল "হাঁ ডাকাতেরই বটে?" ইহা শুনিয়া আরোহীরা বলিল "খুব তাড়াতাড়ি নৌকা চালাও উহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে আর ধরিতে পারিবে না শীঘ্র চালাও।" কিন্তু মাঝিরা সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়া বসিল। তাহারা ঠিক বিপরীত দিকে পুনরায় চালনা করিল। ইহা দেখিয়া আরোহীদের ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইল। রঘুনাথ নামে একজন পালোয়ান আর বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ও প্রচণ্ড বেগে মাঝিকটাকে প্রহার করিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিজেরাই নৌকা চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নৌকাখানার লোকসংখ্যা অনেক বেশী সুতরাং তাহারা অতি সহজেই এই নৌকাখানাকে ধরিয়া ফেলিল। ডাকাতের নৌকা হইতে একজন এই নৌকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ওরে একটু আগুন দিবি?" রঘুনাথ বলিল "ভাই মোদের আগুন নাই।" ডাকাতটী অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়া বলিল, তোদের যার যা আছে আমাদের দে। রঘুনাথ চুপি চুপি তাহার সঙ্গী বিশ্বনাথকে কহিল ভাই, গতিক ভাল নয়, শীঘ্র লাঠিগাছ নিয়ে বেরিয়ে এস। তারপর ডাকাতদের সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই আমরা দিতে প্রস্তুত আছি, তোমরা তোমাদের নৌকা নিকটে লাগাও।" যেমনি ডাকাতরা তাদের নৌকা রঘুনাথদের নৌকার নিকটে লাগাইল অমনি রঘুনাথও বিশ্বনাথ প্রচণ্ড বেগে তাহাদের লাঠিদ্বারা ডাকাতদের জন কয়েককে এমনি প্রহার করিল যে তাহারা তখনই নদীগর্ভে নিপতিত হইয়া কোনদিকে যে চলিয়া গেল তাহার কোন ঠিকানা রহিল না হঠাৎ তাদের এবংবিধ আক্রমণে ডাকাতরা হতভম্ব হইয়া গেল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহারা বর্শা লইয়া আল্লা হো রবে দিগন্ত কাঁপাইয়া লাফাইয়া উঠিল কিন্তু রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ ডাকাতের নৌকায় এমন ধাক্কা মারিল যে তাহারা তখনই স্রোতের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল। আর তাহারা উহাদের আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। বিশ্বনাথ প্রভৃতি নিরাপদে তাহাদের গন্তব্য পথে চলিল।

গোধূলি

শ্রীঅমূল্যকুমার বিশ্বাস ২য় শ্রেণী

দিনের আলো ফুরিয়ে এ'ল
সূর্য্য নেমে গেল।
সাঝ আকাশের রাঙ্গা কোলে
মিটি মিটি আলো।
নীল বসনের রাঙ্গা আচল
অতি মনোহর,
আকাশ যেন দিলেন প'রে
করি সমাদর।
রাঙ্গা আলোয় রঙ্গিয়ে গেল
ধরণীর ছবি,
আল্তা যেন পরিয়ে দিলে
প্রকৃতিকে রবি।

অৰ্দ্ধ আলোকে অৰ্দ্ধ আধারে
রক্ত আভা ফোটে।
দেখালে যেন লজ্জাবতীর
লাল আভা ঠোটে।
দিনের শেষে শ্রান্ত জগৎ
প্রফুল্লিত মন,
ক্ষণেক হেরে শরতের এই
নন্দন কানন।
পচিম পারের রাঙ্গা ছবি
অতি অপরূপ,
কিবা নয়ন-রঞ্জন এই
গোধূলির রূপ।

Presidential Address

By **Rai J. N. Ghose Bahadur, Chairman Dt. Board, Khulna,** ***at the inaugural meeting of the Students' Parliament of Khulna Town students' Association, held on Friday, the 17th January, 30 at 6 P. M. in C. B. Hall.***

Brother Students,

I call you brother as although I have long left my scholastic career I still claim to be a student and it is my earnest hope that when my decaying physical powers will compel me

to take leave of active life I may be permitted to take repose amid my books. You have done me a great honour by inviting me to preside over this inaugural meeting o' your association. Your invitation has for the moment carried me back into the dream land of youth when the world and life had a meaning and a spell which realities have now proved to be all moonshine. Youthful imagination soars high, higher than the stars and heavens but it is shortly realised that the earth where we live in is but at the bottom of the universe; yet these dreams play a great part in shaping the career of a young man and History furnishes examples even of great lives which accomplished super-human feats and marvels hardly dreamt of in their dreamy days. I wish and pray to God that many, if not all, of you may be fortunate like the chosen few.

It is a high privilege to be a student and it is higher still to be a youthful student. A student of advanced years has hardly any earthly future before him, but a young man looks forward to a great and bright career which he has got to shape through his studies and activities. He is the hope of his parents; he is the hope of his country. My young friends! Remember you are the future nation of the country and by your actions you can either make or mar its destiny. The altitude of your achievements will be the measure of the place your country will occupy among the nations of the world your attainments should not be limited to one or "a few directions only but should be spread over all spheres of possible human activities. Unless you can produce from among yourselves a large number of scientists, explorers, adventurers, industrialists, merchants, artists, poets, philosophers, statesmen, journalists, musicians soldiers, doctors and divines of outstanding brilliance I do not foresee any glorious future of my country. I ask you to love your country intensely and even

desperately, for I cannot conceive of any true education which does not teach patriotism. ; but that love should be deep, abiding and fruitful of real and substantial results and must not end in temporary froth and superficial effervescence. In the intensity of your love for your country do not lose sight of your mission. Do not forget that a student life is but a preparatory stage to rise to the fullness of manhood. It is not ordinarily a time when you should jump into the struggles of life but it is now that you can prepare yourself for the struggles. Let not your genius be nipped in the bud but allow it to grow to its full height and then it will be an invaluable asset to the country. This is the time when you should harness your body, mind and intellect with vigour, character, knowledge and capacity. I do not ask you to eschew politics. I am not one of those who see spectres in politics in students. I should rather ask those of you who aspire to enter public life as that of a journalist to study politics and economics deeply and devoutly, but they should not in my opinion, jump into the practical field before maturity. I do not like, however, that all of you should study politics. The nation wants badly more and deeper votaries of science and various other branches of learning. You will be hardly called a patriot unless you listen to the call of your country according to its real requirements. Development of one limb alone in a body politic as in a human body while other parts are starving is a malignant growth and the body under its influence becomes hamstrung and useless. Keep firmly and tenaciously to the studies and researches of your own liking but at the same time cultivate the qualities of a true man. I do not want you to be pignies and old fogies— I want you to be giants running abreast with, nay, in advance of the time. Your mental and physical equipments should enable you to weather any storm and never to

wilt under any trials and tribulations. Think bravely and nobly, speak bravely and nobly, act bravely and nobly, work with head erect and straight spine and avoid mean and dastardly acts of which your parents and country may be ashamed, be adventurous-- even dangerously adventurous in persuit of knowledge but keep religiously away from sin and crime. Have courage of your conviction but cultivate spirit of tolerance of others views. Have firm confidence in your ownself but rise above puppyism. Acquire healthy and hard working physique by regular and temperate habits and exercises. Be truthful and generous. Cherish charity for all and sympathy for the distressed and do social and humanitarian work whenever occasion arises. Be devoted students and practise rigid discipline. Entertain sincere respect of your superiors and above all have absolute faith in God.

"Let knowledge grow from more to more;
But more of reverence in us dwell"

These are counsels which are not certainly new to you but they cannot be too often repeated as they are so often forgotten. They are old and yet ever green. Following them men became great in the past and will be at least equally so in future.

I am glad to find that the programme which you are going to adopt this evening includes items of activities which will lead to the attainment of some of the indicated above. I wish you all success in this attempt of yours in the most right direction and I hope if you stick to the path chalked out at to-day's meeting steadfastly neither you nor your country will have any reason to grieve. But before I sit down I must try to impress upon you the supreme virtue of discipline. Without rigid discipline no organisation can stand. Without discipline no nation can rise. Obedience to order of the constituted authority

is no weakness but the height of strength and virtue. Call to your mind the scene of Dice play in the Mahabharata visualize the wriliing agony of Bheema, the strongest and bravest man ever conceived in the History or literature of any country when Draupady was being insulted in his presence. Realize in your mind the supreme strength exhibited in submitting to the pacific gestures of Judhisthira even under that gravest provocation. Sons of that great race which produced such examples of strength, discipline and other noble virtues, will you not prove yourselves worthy of that great and glorious past ?

পৃথ্বীরাজ

শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়—১ম শ্রেণী।

(১)

উঠিল তুমুল নাদে যুদ্ধের বাজনা
কাঁপাইয়া বৃক্ষমূল
কাঁপাইয়া বৈরিকুল
বাজিতে লাগিল ঘন হিন্দুর দামামা।

(২)

সারি সারি রাজপুত পৃথ্বী সৈন্য যত
পদ ফেলি তালে তালে
গৌরবের দীপ্তি ভালে
শোভিতে লাগিল যেন কালান্তক শত।

(৩)

সম্মুখে চলিল বীর দিল্লী অধিপতি
সংযুক্তার চিন্তামণি
হিন্দুরাজ কুলমণি
চলিল বীরের ন্যায় নৃপকুল পতি।

(৪)

হেলায় নির্ভীক ভাবে থানেশ্বর মাঝে
দাঁড়াইল সৈন্যগণ
বাজিল দামামা ঘন
প্রস্তুত হইল সবে সাজি বীর সাজে।

(৫)

জমিল উভয় দলে যুদ্ধ ঘোরতর
অশ্বে অশ্বে গজে গজে
যুদ্ধ ভেরি ঘন বাজে
কাঁপাইয়া বিপক্ষের সেনার অন্তর।

(৬)

বাজিল হিন্দুব ভেরী ঝম্ ঝম্ ঝম্
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতি
ধাইল শত্রুর প্রতি
বিস্মিত পাঠান সেনা হেরি সে বিক্রম।

(৭)

আহত সৈন্যের দৃশ্য বড় শোচনীয়
হস্ত পদ শূন্য কেহ
কারো বা দ্বিখণ্ড দেহ
বহিল রক্তের নদী, গৃধ্র বাঞ্ছনীয়।

(৮)

আবার আবার সেই ঝম্ ঝম্ ঝম্
পলাল বিপক্ষগণ
করিতে নারিয়া রণ
পলাইল ঘোরীরাজ, দেখি সে বিক্রম।

(৯)

উড়িতে লাগিল গর্ব্বে বিজয় নিশান
জয় ভেরী বাজে ঘন
কাঁপিতে লাগিল বন
অক্ষম আমি সে যুদ্ধ করিতে বাখান।

(১০)

ভীষণ সমর ক্ষেত্র ত্যজি পৃথ্বীরাজ
চলিলেন ধীরে ধীরে
দিল্লীর তোরণ দ্বারে
বিজয় দামামা ভেরী বাজে ঘন আজ।

(১১)

পশিল বিজয়ী সেনা দিল্লী রাজপুরে
আনন্দের কোলাহলে
দিল্লী আজ টলমলে
আনন্দের উৎস বহে নগরে বাহিরে।

(১২)

হেথায় সংযুক্তা সতী প্রফুল্ল বদনে
দাঁড়াইল সিংহ দ্বারে
পতি সম্ভাষণ তরে
পুষ্পমাল্য রাখি হস্তে অতীব যতনে।

(১৩)

পশিলা বিজয়ী পৃথ্বী সিংহদ্বার মাঝে
পুষ্পমাল্য দিয়া গলে
লুটাইয়া পদতলে
কহিলা সংযুক্তা সতী গদ্ গদ্ ভাষে

(১৪)

"ধন্য বীর! শ্রেষ্ঠ তুমি এ বিশ্ব মাঝারে;
তোমার সমান বীর
কোথা বিশ্বে ওগো ধীর?
ধন্য তব দাসী প্রভো, এ ভব সংসারে।"

(১৫)

কহিলা বিজয়ী পৃথ্বী "শুন ওগো ধনি !
তোমা হেন পত্নী যার
আছে কি লো ভয় তার ?
পতি-প্রাণা সাধ্বী তুমি হৃদয়ের মণি।

(১৬)

এতেক বলিয়া দোহে পশিলেক পুরে
বসাইয়া রত্নাসনে
কহিলা আপন মনে
'ধন্য মোর ভর্ত্তা আজি এ বিশ্ব সংসারে।'

(১৭)

খুলিয়া ফেলিলা সতী রণ সজ্জা যত
কুণ্ডল, মুকুট, অস্ত্র
বর্ম্ম আদি রণ শস্ত্র
পুনর্ব্বার সাজাইলা করি মনোমত।

(১৮)

এইরূপে দুই বর্ষ কাটিল আরামে
কিন্তু হায় এই সুখ
বিনাশিয়া এলো দুখ
আক্রমিল ঘোরীরাজ বিপুল বিক্রমে।

(১৯)

আবার বাজিল ভেরী ঝম ঝম রবে
দেশের গৌরব তরে
হিন্দুমান রাখিবারে
সাজিল সন্তান সবে ভীষণ আহবে।

(২০)

মিলিল নৃপতিবৃন্দ স্বদেশের তরে
পৃথ্বীর পতাকা তলে ;
দাঁড়াল বিপুল বলে,
হিন্দুর সে পরাক্রম আজ কেন নাইরে ?

(২১)

ধিক্ ধিক্ জয়চন্দ্র তোমা হেন জনে
হিন্দুর পরীক্ষা দিনে
ভাবিলে না তারে মনে
মিলিত হইলে শেষে বিপক্ষের সনে ?

(২২)

সাজিল দিল্লীর রাজা সংগ্রামের সাজে
হাতে অস্ত্র খরতর
বর্ষা করে বীরবর
সংযুক্তার কাছে গেলা সাজি রণ সাজে।

(২৩)

কহিলেন পৃথ্বীরাজ সোহাগের স্বরে
"শুন প্রিয়ে, সুকমতী
আসি তবে, ওগো সতি !
বিজয়ী হইয়া পুনঃ ফিরিব গো পুরে।"

(২৪)

কহিলা সংযুক্তা সতী গদ্ গদ্ ভাষে—
'যাও ওগো প্রাণময়
লাভ করি যুদ্ধ জয়
আসিও ফিরিয়া দেব বিজয়ীর বেশে।"

(২৫)

বিদায় লইয়া তবে চলিলেন বীর
চাহিয়া তাঁহার পানে
সংযুক্তা [illegible]
"এই বুঝি শেষ দেখা" – চক্ষে বহে নীর

(২৬)

বিপুল বাহিনী সহ চলিলা নৃপতি
ঘন ঘন বাজে ভেরী
ইষ্টদেব-নাম স্মরি
আক্রমিল শত্রুগণে নবোৎসাহে মাতি।

(২৭)

মাভৈঃ, মাভৈঃ রবে বিপুল বিক্রমে
ধরি অস্ত্র খরতর
দিল্লীপতি পৃথ্বীবর
আক্রমিল শত্রুসেনা ভীম পরাক্রমে।

(২৮)

ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের পারা মোসলমান সেনা
আক্রমিল রাজপুতে
ঢাল খড়্গ বর্শা হাতে
'দীন' 'দীন' হুহুঙ্কারে স্তব্ধ হিন্দুসেনা।

(২৯)

হইল ভীষণ যুদ্ধ ধারণা অতীত
মরিল অসংখ্য সেনা
নাহি তার কোন সীমা
শবলুব্ধ গৃধ্রগণ অতি হরষিত।

(৩০)

আবার আবার সেই 'আল্লা আল্লা নামে'
নাদিয়া ঘোরীর সেনা
ঘিরিল বিপক্ষ সেনা
বিস্মিত হইল হিন্দু বিপক্ষ-বিক্রমে।

(৩১)

যায় যায় হিন্দু নাম যায় রসাতলে
গেল গেল গেল বুঝি
হিন্দুর মহিমা আজি
আর বুঝি হিন্দুমান না থাকে ভূতলে।

(৩২)

ঐ, ঐ, ওই দিকে ও কি দেখা যায়?
ঘিরিয়া দিল্লীর রাজে
মোসলেম সেনা গর্জ্জে
একাকী দিল্লীর পতি শত্রু প্রতি ধায়।

(৩৩)

ক্ষত অঙ্গ, ক্ষত বর্ম্ম, ক্ষত ঢাল, ক্ষত অস্ত্র
তবু কিবা তেজঃমূর্ত্তি
সমরে অতুল স্ফূর্ত্তি
ধাইল শত্রুর প্রতি ল'য়ে অস্ত্র শস্ত্র।

(৩৪)

শত শত বিপক্ষের ক্ষিপ্ত আক্রমণে
লুণ্ঠিত হইল বীর
নয়নে বহিল নীর
ইষ্ট দেবে স্মরিবারে লাগিলেন মনে।

(৩৫)

অস্তে গেল দিনমণি সঙ্গে গেল চ'লে
দেশের গৌরব তরে
দিল প্রাণ অকাতরে
ধন্য বীর পৃথ্বীরাজ এ বিশ্ব ভূতলে।

(৩৬)

নাদিল ঘোরীর সেনা বিজয় উল্লাসে
পরাজিত শত্রু প্রতি
ধাইল উল্লাসে মাতি
নাদিতে লাগিল ঘন মনের হরষে।

(৩৭)

হেথায় সংযুক্তা সতী বসিয়া বিরলে
ভাবিতেছেন কত কি যে!
হৃদয়ে আশঙ্কা বাজে
ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়ে পড়েন ভূতলে।

(৩৮)

এ হেন সময়ে দূত কহিল আসিয়া
'শুন মাতঃ! মোর কথা
ভয়ঙ্কর সে বারতা
নিহত সম্রাট আজি—ওঃ ফাটে মোর হিয়া

(৩৯)

দূতের মুখেতে শুনি পতির নিধন
জ্বালিয়া অনল রাশি
সংযুক্তা তাহাতে পশি
পতিপ্রাণা ত্যজিলেন অকাতরে প্রাণ।

ভূরি ভোজন।

(শ্রীলবচন্দ্র পাল, শিক্ষক)

অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের মতে পরিমাণ মত ভোজনই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান উপায়। অতিরিক্ত ভোজনে যেমন অম্ল, উদরাময় প্রভৃতি কঠিন রোগ হয় অত্যন্ত কম ভোজনেও সেইরূপ নানাপ্রকার ব্যাধির উদ্ভব হয়। এখনও কোন কোন স্থানে নিমন্ত্রণে বেশী খাইতে পারিলে কর্ত্তা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন আসিলে আকণ্ঠ ভোজনের পরও যদি তিনি আরও বেশী খাইতে পারেন তবে কর্ত্তা যেন নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। এ ত গেল কর্ত্তৃপক্ষের কথা। খাবার ভাল হইলে খাইবার কালে যে পরিমাণের কথা মনে থাকে না এমন কি পেটে কি পরিমাণ রাখা যাইবে

তদ্বিষয়ে বিবেচনা বিহীন হইয়া কেবলই চালাইতে থাকে, এমন লোকও বিরল নহে। নিম্নে কয়েকটী ভূরি ভোজনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ--

(১)

জমিদার বিহারী বাবুর বাড়ীতে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ, বিপুল আয়োজন, বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বহু ভোজনকারী, ভজগোবিন্দ, থাকহরি, মদন বিলাসানন্দ তর্কচঞ্চু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও বাদ পড়েন নাই। জমিদার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানাপ্রকার ভোজনে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের আশায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব পুত্র কন্যা খেঁদী, পুটিলী, ভুলু, হুলু প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে উপস্থিত। নিমন্ত্রিত লোক খাইতে বসিয়াছে। বিহারী বাবু স্বয়ং পরিদর্শন করিতেছেন। পরিবেশনকারী রামদাস থাকহরিকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! আর দুইটী সন্দেশ দিব। থাকহরি না, না, বলিয়া নিষেধ করায় রামদাস ফিরিয়া যাইতেছিল, ইহা দেখিয়া বিহারী বাবু রামদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে রামদাস, থাকহরিকে আর দিলে না কেন? রামদাস ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল--তিনি আর নিলেন না, কেবল না, না, বল্লেন। বিহারী বাবু বলিলেন না, না, করিলে কি নিষেধ করা হল?

হাঁ হাঁ দদ্যাৎ, হুঁ হুঁ দদ্যাৎ, দদ্যাৎচ শির সঞ্চালনে
হস্ত সঞ্চালনে দদ্যাৎ, ন দদ্যাৎ ব্যাঘ্র ঝম্পনে।

অর্থাৎ হাঁ হাঁ করলেও দিবে, হুঁ হুঁ করলেও দিবে, শির সঞ্চালনে -- মাথা নাড়িয়া নিষেধ করলেও দিবে। যখন বাঘের মত ঝাঁপ দিয়া পাতের উপর পড়বে, চীৎকার ক'রে সর্ব্ব অঙ্গে ঘাম ঝরবে চক্ষে জল ঝরবে তখন কেবল দিবে না, বুঝলে।

(২)

চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়, নানাপ্রকার খাদ্যে ভূরি ভোজনের পর প্রত্যেকে অতি কষ্টে বাড়ীপানে যাত্রা করিল। প্রত্যেকেরই পুত্র কন্যার কাঁধে বা মাথায় কিছু কিছু খাবার চাপাইয়া চলিয়াছে, পথে খেঁদী ভূরি ভোজনের চাপে এবং অতিরিক্ত বোঝার চাপে হঠাৎ একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিল। সমুদয় খাবার নষ্ট হওয়ায় খেঁদীর বাবা খেঁদীকে নানাপ্রকার বিশেষণে ভূষিত করিয়া বলিল ওরে পোড়ারমুখি, খাবার গুলি রেখেও ত মরতে পারতি। এদিকে প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে

তর্কচঞ্চু থাকহরিকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হে— থাকহরি ভোজনটা নেহাৎ মন্দ হয় নি! কি বল? থাকহরি বিশ্বনিন্দুক, নিন্দা না করিলে নাকি তার হজম হয় না; কিন্তু এখানে নিন্দার কিছু না পাইয়া স্বীয় ভূড়িতে হস্তসঞ্চালন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল আরে যাই বল তর্কচঞ্চু এত ভালও কিন্তু ভাল নয়।

(৩)

একজন এত ভোজন করিয়াছে যে চলিতে অক্ষম, তাই দুই জনের কাঁধে ভর দিয়া বমি করিতে করিতে অতি কষ্টে চলিয়াছে। ইহা দেখিয়া একজন লোক বলিল, বেটা কত খেয়েছে দেখ, খাবার কালে আর ওজন থাকে না। শুনিয়া ঠাকুর রাগিয়া হিন্দিতে বলিতে আরম্ভ করিল (অত্যন্ত রাগ হইলে তিনি হিন্দি বলেন বাঙ্গালা ভাষা নাকি নিস্তেজ) হাম আর কেয়া খাতা হায়, যো খাতা হায় সো পিছুমে আতা হায়।

(৪)

বল হরি, হরি বোল। একটু পরে একজন পেটুক আসিলেন, অতিরিক্ত ভোজনে তাঁর পেটটা ঢাকাই জালার মত হইয়া উঠিয়াছে তিনি নড়িতেও অক্ষম, তিনি অতি কষ্টে খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন, আর চারিজন লোক খাটিয়া খানি কাঁধে করিয়া চলিয়াছেন। তিনি নিশ্চিন্তে শুইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে তুড়ি দিতেছেন, জ্যান্ত মরা যাইতে দেখিয়া পথের লোক হাসিয়াই অস্থির।

(৫)

অচ্যুতানন্দ নাকি দেড়মণ ভোজন করেন। তাই লোকে তাকে দেড়মণী অচ্যুত বলে। এ নিমন্ত্রণে তিনি দেড়মণের উপর খাইয়া পেটের বেদনায় শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছেন, ভূরি ভোজনে পেটটা এত ফুলিয়া উঠিয়াছে যে কাল কাল শিরাগুলি দেখা যাইতেছে। বেগতিক দেখিয়া বাড়ীর লোকে কবিরাজ ডাকিয়া আনিল, বহুদর্শী কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষার পর সরিষা পরিমাণ একটা হজমীর বড়ী লইয়া বলিলেন, ঠাকুর মশায় এই বড়ীটা খান দেখি। দেড়মণী অচ্যুত বলিলেন আপনি কি আমাকে এত বোকা মনে করেছেন, একটা বড়ী পড়িবার যদি জায়গা থাকত তবে কি আর অমনি উঠে আসি? কোন মতে চেষ্টা চরিত্তির করে একটা রসগোল্লা খেয়ে আসতুম। রোগীর কথা শুনিয়া কবিরাজের ত চক্ষু চড়ক গাছ। তিনি বলিলেন দাঁড়ান

আমি আপনাকে বমি করাচ্ছি, অচ্যুত অনুনয় করিয়া বলিলেন, মাপ করবেন মশায়। আর যাই বলুন শুধু ঐ টুকু বলবেন না। এত কষ্ট ক'রে খেয়ে আমি অপব্যয় করতে পারব না।"

(৬)

একজন শুধু ফলার এত খাইয়াছে যে, বুক আর পেট প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি আর চলিতে না পারিয়া নিকটস্থ এক নদীতে আকণ্ঠ জলে নামিয়া চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়া পান চিবাইতেছেন, নিকট দিয়া একটী গরুর শবদেহ ভাসিয়া যাইতেছে, উহা তাহার গায় ঠেকায় সে নিমিলিত নেত্রে গরুর পেটে হাত দিয়া বুঝিল যে এই পেটটীও ফুলিয়া রহিয়াছে, সে নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া নিমিলিত নেত্রেই বলিল—কি ভায়ারও ফলার নাকি।

শুভ মিলন।

শ্রীরামরতন বসু, ১ম শ্রেণী।

"আচ্ছা নরেন, আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি আমাকে মারিলে? এই বক্তাটীর নাম সুরেন। সে শৈশবকাল হইতেই পিতৃহীন। সুতরাং মা ভিন্ন এ সংসারে তাহার আর আপন বলিতে কেহ নাই। অবস্থাও যে বিশেষ ভাল তাহাও নহে। কোন রকমে তাহারা দুইটা খাইয়া পরিয়া দিনাতিপাত করে। তাহার বয়স ১০ বৎসর। যে গ্রাম্য স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িত। গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও জনপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকজন জমিদারও সেখানে বাস করে। অমর বাবু এই গ্রামের অন্যতম জমিদার। জমিদারদিগের মধ্যে তাহারই সম্পত্তির আয় বেশী এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। নরেন এই অমর বাবুর পুত্র। নরেন ব্যতীত অমর বাবুর অন্য কোন পুত্র ছিল না। সেইজন্য তিনি উহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং যে যখনই যাহা আবদার করিত তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতেন। সেও ইহাতে

ক্রমে খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার পিতা মাতা ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। সে সুরেনের সহিত পড়িত।

সুরেন লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। সে প্রতি বৎসর প্রথম হইয়া ক্লাসে উঠিত। তাহার স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল। সর্ব্ববিষয়ে সে স্কুলের মধ্যে অগ্রগণ্য। শিক্ষক মহাশয়ও তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এই সমস্ত কারণে নরেন তাহাকে সর্ব্বদাই হিংসা করিত। কিরূপে তাহার অনিষ্ট করিবে তাহাই সর্ব্বদা সে খুজিয়া বেড়াইত।

সেদিন স্কুলে নরেন পড়া বলিতে পারে নাই বলিয়া শিক্ষক মহাশয় সুরেনকে উহার কান মলিতে বলেন। একেই সে সুরেনকে সর্ব্বদা হিংসা করিত তারপর সকলের সম্মুখে আজ এই অপমান। সুতরাং তাহার পক্ষে ইহা একেবারেই অসহনীয়। সে ভাবিল ইহার মূল নিশ্চয়ই সুরেন। সুতরাং সে যে ভাবেই হউক ইহার প্রতিশোধ লইবে স্থির করিল। ছুটী হইবা মাত্র সে কতকগুলি বালকের সহিত মিশিয়া তাহাকে মার দিল। তখন সুরেন বলিল, "আচ্ছা নরেন, আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি আমাকে মারিলে? আচ্ছা ভাই আমাকে মারিয়া তুমি কি তোমার মনোব্যথা দূর করিতে পারিবে কাহারও সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া কি কখনও মনে শান্তি লাভ করা যায়। স্কুলে তুমি শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছ তাহাতে তুমি কি মনে কর যে শিক্ষক মহাশয় তোমাকে অন্যায় করিয়া মারিয়াছেন? যদি তুমি তাহা মনে কর তবে সেটা তোমার ভুল ধারণা। শিক্ষক মহাশয় কি মারিতে ভালবাসেন, না তোমার সহিত তাঁহার কোন শত্রুতা আছে? তিনি আমাদের ভালর জন্যই শাস্তি দেন। তিনি তোমার অন্যায় দেখিয়াছেন বলিয়া তোমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তুমি আমার উপরই বা কেন ক্রোধ করিতেছ?" এই সকল কথা শুনিয়া নরেন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিল, "ভাই আমাকে ক্ষমা কর। আজ হইতে তুমি আমার এই পাপময় জগতে পথ প্রদর্শক।" তখন সুরেন আনন্দাশ্রুলোচনে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ভাই আজ আমাদের শুভ মিলন।"

মোছাফিরের ডায়রী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিজয়চন্দ্র ঘোষ, শিক্ষক।

গয়া হাওড়া থেকে ২৭২ মাইল। ষ্টেশনে পৌঁছে অতি কষ্টে পাণ্ডাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে সুরজমল ধরমশালায় আশ্রয় নিলাম। পূর্ব্বে যে যে স্থানে গিয়েছি কোনদিন কোন ধর্ম্মশালায় থাকিনি কাজে কাজেই এর পূর্ব্বে আমার ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে একটী ঘর বন্দোবস্ত করে আমাদের দ্রব্যাদি রেখে আমাদের সঙ্গের তালা চাবি দিয়ে ঘরটা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হলাম। পরে প্রাতের আবশ্যক কার্য্যাদি সম্পন্ন করে নিলাম। ক্রমে পাণ্ডাদের এক একজন চর এসে জড় হ'তে লাগ্‌ল। পূর্ব্বে শুনেছি গয়াধামে কোন একজন পাণ্ডার বিনা সাহায্যে পিতৃপুরুষের কার্য্য করা যায় না। কাজেই একজন চর বেছে নিলাম। তার সাহায্যে একখানা গাড়ী করে ফল্গু নদীতীরে গেলাম। ফল্গু বেশ প্রশস্ত নদী কিন্তু জল কোথাও এক হাতের অধিক গভীর দেখ্‌লাম না। তবে স্রোত অতি প্রবল। নদীর জল বেশ স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ, অতি আয়াসের সহিত স্নান করে পূর্ব্ব রাত্রির জাগরণের ক্লান্তি দূর কর্‌লাম্। পণ্ডিতজী তাঁর বিশাল দেহ স্রোতে ছড়িয়ে দিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লেন এরূপ সুন্দর জল যে তা ছেড়ে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা হয় না। দেখ্‌লাম্ জেলেরা দুইজনে ছোট একরূপ জাল টেনে ছোট ছোট সাদা মাছ ধরছে। স্নান সেরে একজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে নদীতীরে পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ এবং যবের ছাতুর দ্বারা পিণ্ড দেওয়ার কার্য্য শেষ করিলাম, তারপর গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দেওয়ার জন্য মন্দিরে গেলাম। পিণ্ড দেওয়ার কি চমৎকার উদার ব্যবস্থা। মনে হ'লে এখনও হৃদয় আনন্দে এবং গৌরবে স্ফীত হয়। কি সার্ব্বজনীন প্রেম এবং উদারতা ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ষোড়শ পিণ্ডদানকালে মাতৃগর্ব্ভে অবস্থান কালের দুঃখ বর্ণনা করিয়া যে মন্ত্র পড়ান হয়েছিল তাহাতে আমাদের বুক ভেঙ্গে কান্না এসেছিল।

পিণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতটা আমার মনে আছে তাই লিখ্‌ছি। প্রথমে পিতৃ মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয়। তারপর নিজের আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য কুলের মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয়। তারপর জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত পরিচিত মৃতব্যক্তিদিগের নাম করে পিণ্ড দেওয়া হয়। পরে সপুত্রক, অপুত্রক, শত্রু, মিত্র, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয়। তারপর মৃত পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি ইতর প্রাণীদিগকে লক্ষ্য করে পিণ্ড দেওয়া হয়। পিণ্ডদান এবং অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করে এবং যথাসাধ্য অন্যান্য মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে পাণ্ডার বাড়ীতে পৌছিলাম। সেখানে আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করে পাণ্ডার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে আমরা ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম। সেদিন আর অন্ন উদরস্থ হ'ল না। কিছু পুরী পেড়া ইত্যাদি দ্বারা জঠরানল নিবৃত্তি করিলাম। আমার সঙ্গী দুইজনের একটু পরিচয় এখানে দেওয়া আবশ্যক। একজন আমার বাল্যবন্ধু জাতিতে কায়স্থ আর একজন আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু নৈয়ায়িক পণ্ডিত জাতিতে শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান, দুর্ব্বাশার ক্রোধ, শঙ্করের তেজ এবং ব্যাসদেবের পাণ্ডিত্য তাঁর মধ্যে বিরাজিত। ক্ষুধা পেলে আত্মহারা তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট। এবিষয়ে তাঁকে সুলেখক জলধর সেনের (এখন রায় বাহাদুর) হিমালয় যারা পড়েছেন তার মধ্যে যে বৈদান্তিক পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ আছে তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হলে তাকে নির্ব্বাপিত করার পূর্ব্বে পণ্ডিতজীর সহিত বিশেষ সতর্ক হয়ে কথাবার্ত্তা বলা আবশ্যক হত। তাঁর সঙ্গে আমার খুটীনাটী বিষয় নিয়ে ঠোকাঠুকি হত এবং তার ফলে ২।৩ দিন পরস্পর আলাপ বন্দ থাক্‌ত। আবার যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্। অপর বন্ধুটী ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের। তার গাম্ভীর্য্য সময় সময় আমাদের একটু চঞ্চল করে তুল্‌ত। তার কোন রুচি বিকার ছিল না, তিনি সুখে দুঃখে সম ভাবাপন্ন এবং সঙ্কল্পে দৃঢ় ছিলেন। আমার পণ্ডিতের মধ্যে যখন একটু গোলযোগ হত তিনি নিরপেক্ষ থেকে শান্তি স্থাপন কর্‌তেন ক্ষুধায় তিনি কাতর হতেন না এবং কোনরূপ আরাম প্রয়াসী ছিলেন না। ক্রমাগত ২।৩ রাত না ঘুমাইলেও তিনি কাতর হতেন না। নিজের পরিচয় কি আর দেব? সেটা

দেওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ নিজের গলদটা নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করার সামর্থ্য আমার আছে বলে বিশ্বাস হয় না। কাজেই সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট এবং চুপ থাকলাম। তবে এটুকু না বলে পারি না যে কয়েকটী বিষয়ে সঙ্গীদের সহিত আমার মোটেই খাপ্ খেত না। ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থানগুলি আমি যে ভাবে দেখ্তে পেতাম আমার বন্ধুদ্বয় তাতে বিরক্ত হয়ে উঠ্তেন। দিল্লী গিয়ে পণ্ডিতজীর সহিত আমার একদম আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। সে যাক্ পরে বল্ব।

অনেক অবান্তর কথা এসে পড়ল, যা হোক্ যে কথা বলছিলাম, কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম করে আমাদের ধর্ম্মশালা হতে মাইল খানেক দূরে অবস্থিত "রাম শিলা" পাহাড় দেখ্তে গেলাম, কাছে গিয়ে দেখি বহুলোক পাহাড় থেকে পাথর ভাঙ্গছে এবং ডিনামাইট দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর পাহাড় থেকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। পাহাড়ের পাদদেশে খোট্টাদের একটী ক্ষুদ্র পল্লী, সেই দিক দিয়ে পণ্ডিতজী এবং আমি পাহাড়ে সোজাভাবে উঠ্তে আরম্ভ করলাম। পণ্ডিতজী তাঁর বিশাল বপুখানা অতিকষ্টে টেনে তুল্তে লাগ্লেন। একবার পা পিছ্লে তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করার উপক্রম ক'রে ছিলেন কিন্তু অতি কষ্টে একটী প্রকাণ্ড শিকড় ধরে সে যাত্রা রক্ষা পান। বহু কষ্টে এটা ওটা ধরে পাহাড়ের শিখর দেশে আরোহন করে একটী সুন্দর মন্দির দেখ্তে পেলাম। মন্দিরের পার্শ্বে একটী ছোট রকমের নাট মন্দির আছে। সব পাথর দিয়ে তৈরী। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর বিগ্রহ আছেন। পাহাড়ের যে স্থানে মন্দিরটী অবস্থিত সে স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং মনোরম। সেখান থেকে সমস্ত গয়া সহরটী বেশ সুন্দর-রূপে দেখা যায়। মনে করে ছিলাম এত উপরে পাণ্ডার আধিপত্য পৌছে নাই, কিন্তু দেখ্লাম সে স্থানেও প্রভুরা হাজির আছেন। পূর্ব্বদিকে ফল্গু একটী শুভ্র রজত ধারার ন্যায় বিরাজিতা। পাহাড়ের উপর থেকে উত্তর পূর্ব্বদিকে একটী কুষ্ঠ আশ্রম দেখা গেল। এমন সুন্দর লাইন করে ঘরগুলি সাজান পাহাড়ের উপর থেকে একখানা ছবির মত দেখা যায়। আমাদের একবার সেখানে যাবার বড় ইচ্ছে হল কিন্তু সহৃদয় পাণ্ডাজী একেবারে আড় হয়ে পড়্লেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর নাম্বার উপক্রম করায় পাণ্ডাজি একটী সিড়ি দেখিয়ে দেলেন। দেখ্লাম

আমরা না জেনে কি কষ্ট করে এবং জীবন বিপদাপন্ন করে পাহাড়ে আরোহন করেছি। পাহাড়ের উত্তর পূর্ব ধার দিয়ে বিস্তৃত প্রকাণ্ড সিড়ি একদম পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। একটী শিশুও সহজে সেই সিড়িদিয়ে নেমে যেতে পারে। সেইটীই পাহাড়ে উঠা নামার পথ। আমরা ধীরে ধীরে নামতে আরম্ভ করলাম। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সাধু সন্ন্যাসীদের থাকবার গুহা দেখলাম। একটী গুহার মধ্যে হোমের পোড়া কাষ্ঠ এবং ভষ্ম পড়ে আছে দেখলাম। গুহায় প্রবেশ দ্বারে পাহাড় কেটে কি লেখা রয়েছে কিছুই পড়া গেল না। পাহাড়ের নিম্নভাগে ঢালুর উপর কয়েকটী সুন্দর সুরক্ষিত দালান দেখলাম। সেগুলি সাধুদের থাকবার মঠ, জিজ্ঞাসা করে জানলাম পাহাড়ের উপরিস্থিত মন্দির, ঐ সিড়ি এবং মঠ গয়ার রাজা প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছেন। আমরা সহজে নেমে পড়লাম বটে কিন্তু দেখলাম, আমরা যে স্থান থেকে পাহাড়ে আরোহন করেছিলাম, সে স্থান হতে বহুদূর এসে পড়েছি। প্রায় দুই মাইল হেটে আমাদের আর একজন বন্ধু যে স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। পূর্ব্বে বলতে ভুলে গিয়েছি তিনি আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে আরোহন না ক'রে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সেই পল্লীর প্রান্তে এক খানা পাথরের উপর বসে ডিনামাইট দিয়ে পাথর ভাঙ্গা দেখছিলেন। তারপর তিন জনে মিলে আর কয়েকটী স্থান দেখে সন্ধ্যা বেলায় ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম।

পরদিন ২২শে অক্টোবর তারিখ অতি প্রত্যুষে একখানা একা করে আমরা বুদ্ধগয়া দেখতে রওনা হলাম। তখন আকাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। সমস্ত রজনী আকাশটা মেঘে ঢাকা ছিল এবং টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। শ্রীভগবানের নাম করে আমরা রওনা হলাম। বুদ্ধগয়া গয়া ষ্টেসন থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। পথে ভিজতে ভিজতে নানা রূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। এককায় K.B.L.R. এর চেয়ে অধিকতর সুবন্দোবস্থ ছিল না কাজেই সামান্য বৃষ্টিতেও আমাদের বেশ ভিজতে হয়েছিল। ডানদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ বামদিকে একটু দূরে ফল্গু নদী তার ও পারে পাহাড় শ্রেণী দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম। দেখলাম উপবীতধারী ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে জমি চাষ কচ্ছেন। মধ্যে মধ্যে রাস্তার পার্শ্বে ইন্দারা আছে। পথে পথে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একটী পয়সার জন্য নানারূপ বুলি বলতে বলতে গাড়ীর

পিছু পিছু ছুট্‌তে লাগ্‌ল। তাদের মধ্যে কাউকে একটী পয়সা দিলে আর নিস্তার নাই সবাই একযোগে পেয়ে বসে। এমনি মজা, যে দেখা যাচ্ছে দূরে ছেলেরা খেতে কাজ কর্‌ছে গাড়ী তাদের কাছে অগ্রসর হলে তারা যার যার কাজ ফেলে গাড়ীর পিছু পিছু ছুট্‌তে থাকে। একটা পয়সার লোভে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ১ মাইল দেড় মাইল চলে যায়। শেষটায় কিছু না পেয়ে নানারূপ বক্‌তে বক্‌তে ফিরে। প্রায় বেলা ৯ টায় আমরা বুদ্ধ গয়ায় পৌঁছিলাম। আকাশ ক্রমে ক্রমে মেঘ মুক্ত হল সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। আমাদেরও মনে স্ফুর্ত্তি হ'ল। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মঠ দেখতে পেলাম। সেদিন অষ্টমী পূজার দিন। সেখানে বেশ ঘটা ক'রে মায়ের পূজা হচ্ছিল। মঠের সংলগ্ন ভূমি খুব বড়। অনেক গুলি দালান আছে। বিহার উড়িষ্যার গভর্ণর কিম্বা অন্য কোন বিশেষ গণ্য মান্য ব্যক্তি গেলে তাঁহাদের থাক্‌বার জন্য রাজ প্রাসাদ তুল্য সুসজ্জিত প্রকাণ্ড একটী দালান আছে। তার পর মোহান্তজীর প্রাসাদ দেখ্‌তে গেলাম। সংসার ত্যাগী নিশ্চিন্ত, উদাসীন মোহান্তজী আরাম সাগরে হাবু ডুবু খাচ্ছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল না। তখন তিনি স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দুই ব্যক্তি তাঁর বিশাল ভুঁড়ি এবং কেশ শূন্য মস্তকে তৈল মর্দ্দনে নিযুক্ত ছিল। দেখ্‌লাম সেই অনাশক্ত পুরুষের ভোগ্য বস্তুর কোনটার অভাব নাই। জুড়ীগাড়ী, মটর, ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, এর কোনটার অভাব নাই। একটী প্রকাণ্ড হলে ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসে বহু সন্ন্যাসী নানা গ্রন্থ পাঠ কচ্ছেন। বৎসরের মধ্যে মাত্র অষ্টমী পূজার দিন তথায় ছাগ বলি হয়। সে স্থানে হোমের যে রূপ বিরাট আয়োজন দেখ্‌লাম পূর্ব্বে কোথায়ও সেরূপ দেখিনি। একটী প্রকাণ্ড পাকা ত্রিকোণাকারের কুণ্ড আছে তার মধ্যে বড় বড় গোটা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালা হয়েছে। একটী বড় জালা পুরে ঘৃত রাখা হয়েছে এবং একটী পেয়ালা পুরে ঘৃত ঐ অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কুণ্ডের চারি পার্শ্বে কয়েক জন সন্ন্যাসী মন্ত্র পাঠ কচ্ছেন। সবাই দেখলাম কাজে ব্যস্ত দুটো কথা জিজ্ঞাসা করে জান্‌বার মত কাউকে পাই না। অতি কষ্টে একটী মাদ্রাজী যুবককে পেয়ে তার কাছে জিজ্ঞাসা করে কিছু কিছু জানা গেল। তিনি বলিলেন বাঙ্গালী সাধু মাঝে মাঝে ২।১ জন সে স্থানে যান বটে

কিন্তু ২।৪ দিন থেকে চম্পট দেন। তিনি একটী অদ্ভুত কথা বল্‌লেন যে অষ্টমী পূজার দিন যত গুলি ছাগ বলি দেওয়া হয় তার বলি দেওয়ার প্রণালীও অদ্ভুত রকমের এবং প্রত্যেক ছাগ মুণ্ডটী ঐ প্রজ্জ্বলিত বিরাট হোম কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। নেহাৎ কম বয়সের ছাগ বলি দেওয়া হয় না। ঐ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ মৎস মাংসাসী আছেন। কাহাকেও বাধা দেওয়া বা মত লওয়ান হয় না। খাদ্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যেককে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এ ভদ্রলোকটী চমৎকার ইংরাজীতে আলাপ করলেন। তিনি বল্‌লেন সেখানে অনেক ভাল ভাল পণ্ডিতলোক আছেন। তিনি আমাদের ওখানে প্রসাদ পাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন আরো বল্‌লেন আর ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করলে আমরা মোহান্তের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলাপ করার সুযোগ পাবো; মোহান্ত নাকি বেশ সুপণ্ডিত এবং মিশুক লোক। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের ভাগ্যে কোনটীই ঘটে উঠলো না। আমরা সে স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকতে পারলাম না; একটু ঘুরে ফিরে দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এবং যা দেখতে অতদূর ব্যাগ্র হয়ে ছুটেছিলাম সেই বুদ্ধদেবের সাধনা এবং সিদ্ধিলাভের স্থান খুজতে গেলাম। ঐ মঠের অনতিদূরেই সে স্থানটী তথায় অতি সুন্দর নানারূপ কারুকার্য্য শোভিত প্রকাণ্ড একটী মন্দির আছে। মন্দিরটী পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে তৈরী নহে বরং অযোধ্যায় যেরূপ ধরণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির আছে এটা সে ভাবে গঠিত। পাথরের উপর অতি সূক্ষ্ম আশ্চর্য্যজনক কারুকার্য্য করা। মন্দিরের মধ্যে অতি সুন্দর এবং খুব বড় একটী বুদ্ধদেবের মুর্ত্তি আছে। মুর্ত্তিটীকে সজীব বলে বোধ হয়। মন্দিরের চারি কোনে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠার ব্যবস্থা আছে এবং তথায় ভিন্ন ভিন্ন মুর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পেছনে সেই বোধীদ্রুম এবং তার নিম্নে একটী বেদীর উপর বুদ্ধদেব যে প্রস্তর খানার উপর বসে সাধনা এবং সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, দেখতে পাওয়া যায়। বৃক্ষটী যে সেই বোধীদ্রুম সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয় কারণ সেটীকে খুব পুরাতন বলে মনে হয় না তবে পাথর খানা যে সেই মহাপুরুষের আসন ছিল তাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। বেশ বড় রকমের চতুষ্কোণ পাথর। মন্দিরের compoundটী বেশ বড় এবং চারি দিকের জমি হতে

৭।৮ হাত নীচু। দেখ্‌লে মনে হয় এবং বেশ বুঝা যায় যে মাটী খুড়ে সে স্থানটী বের করা হয়েছে। মন্দিরের চারি পাশে, সাহেবদের কবরখানায় ঢুক্‌লে সাধারণ কবরগুলি যেরূপ দেখায় সেইরূপ অনেক গুলি অনুচ্চ ঢিপি দেখ্‌তে পেলাম তার প্রত্যেকটীর কাছে একখানা প্রস্তর ফলক পোতা আছে। তাতে কি লেখা আছে তা আমরা আবিষ্কার করতে পারলাম না। সে স্থানের রক্ষকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে সে গুলির বিষয় বিশেষ সন্তোষজনক জবাব পেলাম না। তারা বলে ও গুলি সমাধি হতে পারে। কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ধর্ম্মপ্রাণ চিনাম্যান দেখ্‌লাম। তাঁরা গড় হয়ে বুদ্ধদেবের আসনের কাছে প্রণাম করলেন এবং কেহ কেহ ঐ স্থানের এবং মন্দিরের ফটো নিলেন। একজন ধনী চিনাম্যান কয়েকজন কর্ম্মচারী সহ এসেছিলেন, লোকটী বেশ সরল এবং ধর্ম্মপ্রাণ; বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করলেন, বুদ্ধদেব এই স্থানে ব'সে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, এই কথা যখন মনে হ'ল তখন সর্ব্বাঙ্গে একটী পুলকের স্পন্দন অনুভব করলাম, তার কাছে আর কয়েকটী দেবালয় দেখে গয়ার দিকে রওনা হ'লাম।

(ক্রমশঃ)

(শ্রীহরেন্দ্র নাথ ঘোষ — ৩য় শ্রেণী।)

শৈশবকাল হইতেই সায়ংকালে নদীতীরে ভ্রমণ করিতে আমি বড়ই ভাল বাসিতাম। কিন্তু আমি যে স্থানে থাকিতাম, সেখানে নদীতীরে ভ্রমণ করিবার সুযোগ ছিল না। নদী সেখান হইতে বহু দূরে। বাগেরহাট মহকুমার একটী গণ্ডগ্রামে আমার মাতুলালয়; আমি সেইখানেই থাকিতাম। আমাদের বাড়ী ছিল খুলনার অপর পারে পালেরহাট। আমাদের বাড়ীর মাত্র ৫০।৬০ হাত দূরে ভৈরব নদ কুল কুল স্বরে মানব জীবনের নশ্বরতা প্রকাশ করিতে করিতে প্রিয় সন্দর্শনে ছুটিয়া

চলিয়াছে। এখানে আমি কিছুদিন ছিলাম। খেলা ধুলা করিয়া সকলে নদীতীরে বসিয়া মনস্তুষ্টিকর গল্প করিত; কেবল অদূরে বসিয়া আমিই রমণীয় সূর্য্যাস্ত দেখিতাম। নদীতীরের শীতল বায়ু সকলের শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহ-মনের অবসাদ দূর করিয়া দিত। সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে অপর পারের বৃক্ষ-রাজির ভিতর এলাইয়া পড়িতেন।

সূর্য্যাস্ত দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিতাম, সূর্য্যদেব যেমন প্রভাতকালে চতুর্দ্দিক মধুর হাস্যচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া উদিত হয়েন, সেইরূপ আমরাও শৈশব কালে মধুর হাস্য দ্বারা মাতাপিতার মনে কতই না আনন্দ দিয়াছি। তারপরে সূর্য্য-দেব যখন মধ্যাকাশে উদিত হইয়া জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করেন, সেইরূপ আমরাও যৌবনে লেখাপড়া শিখিয়া নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকি। মানব জীবনের সহিত সূর্য্যের এত সাদৃশ্য থাকা সত্বেও একস্থানে অতিশয় অমিল আছে, সূর্য্য একবার অস্ত গেলে পুনরায় ফিরিয়া আসে, কিন্তু মানব একবার মরিলে আর ফিরিয়া আইসে না। সূর্য্যাস্তের পরে যেমন সমস্ত প্রাণী আলোকের অভাব বোধ করে, সেইরূপ তুমি যশঃ রাখিয়া যাইতে পারিলে তোমার মৃত্যুর পরে সমস্ত লোক তোমার কথা মনে করিবে।

এই চিন্তা ভিন্ন আর একটী জিনিস আমি প্রায়ই শুনিতাম, তাহা হচ্ছে সঙ্গীত। এক দিন শুনিতেছিলাম একজন নৌকারোহী বীণা-নিন্দিত স্বরে গাহিতেছেন :—

" মায়া মোহে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
না চিন্তিলে নিজ শিব অন্তেরি উপায়।।
দেহ দেহী যে সৃজিল ইন্দ্রিয় চেতনা দিল।
বল বুদ্ধি আদি তব সাধনা সহায়।
অনুচিত মম চিত চিন্তিলে না হিতাহিত।
তারে ভুল এ কি ভুল হায়! হায়! হায়! "

আহা কি সুন্দর হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীত! আমরা এমনই অধম যে দিনান্তে একবার সেই মঙ্গলময়কে মনে করি না। আর একদিন শুনিতেছিলাম এক আরোহী হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিতেছেন :—

"সময়-সিন্ধু-সলিল-মাঝে জীবন সন্ধ্যা আগতপ্রায়।
পার কর হরি এ ভব সাগর, ধরি আমি তব পায়।।
বাল্যকালে হরি ধূলাখেলা করি যৌবনেতে আইলাম।
যৌবন সংগ্রামে, রিপু পরাক্রমে, পরাজিত হইলাম।।
এবে বার্দ্ধক্যে পীড়িত, রসনা জড়িত মুখে —
নাহি স্ফুরে হরিনাম।"

আর শুনিতে পাইলাম না, নৌকা তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়।

(শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় চৌধুরী—শিক্ষক।)

৺কাশীধাম আসিবার পূর্ব্বেই ইতিহাস বিখ্যাত বৌদ্ধকীর্ত্তি সারনাথ ও আধুনিক হিন্দু শিক্ষাকেন্দ্র বারাণসী হিন্দু ও বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগরিত হইয়াছিল। একাকী এ সকল স্থান দর্শন করিলে আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই উপযুক্ত সঙ্গী সন্ধান করিতেছিলাম। সুযোগ উপস্থিত হইল। হরিশ্চন্দ্র ঘাট হইতে ২ জন সঙ্গী সহ ঘোড়ার গাড়ী করিয়া হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে বাস্তবিক হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইলাম। ৺বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কাশী নরেশের রাজপ্রাসাদ রামনগরের অপর পারে যে প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম গৃহরাজি বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু অদ্ভুতকর্ম্মা, দৃঢ়বিশ্বাসী বীর পুরুষের পুরুষকারের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অমানুষিক কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। ১৯১১ সালে মাননীয় পণ্ডিতজী দেশবাসী মহাপ্রাণ দানবীরগণের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন জন্য যে প্রার্থনা করেন তাহা নিষ্ফল হয় নাই। ৩।৪ বৎসর মধ্যে প্রায় ৫০.লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ গত ১৯১৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। গত কার্ত্তিক মাসে আমরা যখন এই শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হই, তখন আমাদের মনে পুরাকালীন নালন্দ, বিক্রমশীলা, ও দন্তপুরা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি জাগরূক হয়। প্রায় ৪০০০ বিঘা জমিতে ১৭৩টী পাকা বাড়ীতে বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইহার মধ্যে প্রায় ২০ মাইল রাস্তা করা হইয়াছে এবং রাস্তার ধার দিয়া প্রায় ২০০০০ বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। ৩২টী বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের জন্য শিক্ষার স্থান, লাইব্রেরী, লেবরেটরী, হোষ্টেল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। লাইব্রেরীতে সর্ব্বপ্রকারে প্রায় ৬০০০০ পুস্তক আছে। ২৫ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করিয়া লেবরেটরী ও তাহার কারখানা ঘর (workshop) নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ২৬০০ শত। ইহার ১৫০০ ছাত্র হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করে। শিক্ষকগণের সংখ্যা ১৬৫। তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের জন্য বাসাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দরিদ্র-মেধাবী ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়া হয় এবং আবশ্যক মত বিনাবেতনে অথবা অর্দ্ধ বেতনে পড়ান হইতেছে। এরূপ ছাত্রগণের সংখ্যাও ৭০০ শতের কম নহে। ব্যায়াম ও খেলার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় কাশী মিউনিসিপালিটীর বাহিরে স্থাপিত বলিয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়কে নিজেদের সুবিধার জন্য কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। একটী গোশালা স্থাপন করিয়া দুগ্ধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ, পূর্ত্তকার্য্য (Engineering) ও অন্যান্য শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পুরাকালে ভারতে যে সকল বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তাহা দর্শন জন্য ও তথায় শিক্ষালাভ করিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বহু পণ্ডিতগণ এ দেশে আসিয়া এ দেশের শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিতেছিলেন। ছাত্রগণ বৌদ্ধযুগের বিখ্যাত নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পাঠ করিয়াছেন। তথাকার বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত শিলাদিত্যের পাদমূলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে চীন পরিব্রাজক পণ্ডিত হুয়েনসাং এ দেশে আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজত্বের

অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ শিক্ষাকেন্দ্রেরও অন্তর্ধান হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগেও যে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব তাহা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশী-ধামের হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

আগামী বারে বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ সারনাথ তীর্থে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বালকগণকে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

Kumbha Mela at Allahabad.

(Akshay Kumar Roychoudhury, teacher.)

Our inquisitive students are, no doubt, anxious to know all about the ground fair which takes place this year after a lapse of twelve years at the confluence of the Ganges and the Jamuna in the sacred city of Allahabad. Pilgrims and Sadhus from all parts of India have assembled there in lacs. The fair lasts for about a month from the Pous Sankranti to the Hindu festival Sreepan-chami. The origin of the festival will be interesting to the boys ; so I shall try to explain it to them at the begining.

When the ocean was churned by the deities and the dem-ons, a pot (Kumbha) of nectar (অমৃত) was got along with other useful and costly things. A quarrel arose between the demons and the gods about the possession of the pot and the latter kept it concealed successively at Hardwar, Allahabad, Dhara (modern-Ujjain) and Nasik (a town on the Godabari). For this reason ascetics and Sannyasies of different sects assembled in those places. Subsequently the great Hindu reformer Sankaracharjya arranged to hold fairs at those sacred places for the meeting of his disciples.

Henceforth the fair is held successively in those places after the lapse of twelve years. It is stated in the Sastras :—

"গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ ধারা গোদাবরী তটে।
কল সাখ্যো হি যোগোঽয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ॥"

There are other slokas from which we learn that the fair is held at Hardwar in Baisak, at Allahabad in Magh, at Nasik in Bhadra and at Ujjain in Baisak at the end of every four years.

This year the fair has been held in the extensive tract of triangular alluvial land at the confluence of the Ganges, the Jamuna and the Saraswati. Suitable and adequate arrangements have been made by the people and the Government to make the fair a complete success. Words cannot express the ways and means adopted by various public bodies under the lead of Rajas, Zaminders and others for the accommodation, board and worship of the Sadhus of all sects and for the convenience of the pilgrims who were about 30 lacs to the lowest computation. Elaborate arrangements were made by various sava samities to help the pilgrims in all possible ways— free distribution of food, medicine, conveyance and what not ! The members of the Bharat Sevasram Sanga— some of whom are known to our boys as a branch of the Sanga has been doing useful works in the town of Khulna and its suburb for a pretty long time rendered excellent services with the help of their volunteers organisations at the Sangam— school and college students recruited from the Allahabad University and the Benares Hindu University. The writer has been fortunate to visit the place and see the vast concourse of Shadus assembled at the sangam. The Railway authorities have opened a Sangam Station for the speedy conveyance of the pilgrims to the centre of the fair. The mela authorities have tried their best to look after the convenience of the pilgrims, sadhus, shopkeepers, volunteers, sevasamities and others. A well-arranged temporary municipal town has been set up

equipped with electric light, pipe-water and other amenities of town life. Special arrangements have been made all over the area for the removal of urive, night-soil and filths.

Pilgrims coming from different parts of the country bathe in the holy Tribeni confluence, offer oblations to their departed ancestors and visit the holy Akshay bata (banian tree) within the Allahabad fort. The authorities have for the convenience of the pilgrims made two passages one for entrance and the other for exist of the pilgrims for visiting the holy tree.

Casualties, no doubt, happen in such a vast assembly— But steps have all along been taken to prevent them. Reports have been received of some casualties. But they are not worth mentioning when we remember that about 40 lacks of men assembled there and there was an actual procession of about 25 lacs on the 29th January (New moon day).

May I ask my young students to be prepared for visiting the scene when the next Kumb mela takes place after 12 years at Tribeni ?

Editorial Notes.

At the beginning of the new session we welcome our newly-admitted boys to co-operate with us in making our Aradhana a success— At the same time we give a hearty send-off to those who have been sent up to appear at the next university examination and hope that the out-going students will not forget their own magazine. We pray to the Almighty for their success not only in the next examination but also in their career.

Admission Test— The number of boys seeking admission in our school this year was so large that we could not accommodate all the boys who passed the admisssion Test which was held on the 10th January last.

Number on the rolls – The number on the rolls increased as a section has been opened in the third class, a new tinshed with pacca floor is being built on the south-east corner of the school compound for keeping drinking water; the room which was so long used for the purpose has been utilised as a class room.

Staff— Babu Nirmal Kumar Sen B. A. B. T. who was on leave joined his post on the 20th January last. The authorities will appoint another graduate strong in English as a new section has been added to the 3rd class during the current year. Our former clerk Babu Jatindranath Bhattacharjya who resigned on account of his ill health joined his post on the 20th January last on an increased pay of Rupees 35/– a month. The Saraswati puja was celebrated in the school as usual with great rejoicings—Sweets etc were given to the students who passed a happy time on the occasion.

Prize distribution—We regret to state that the prizes are not distributed to the meritorious students during the last three or four years. We understand that the authorities will make necessary arrangements to hold the prize-giving ceremony this year as an impetus to the meritorious boys.

New grant in aid rules—In order to improve the condition of the ill paid teachers the education department has fixed a minimum scale of pay of the teachers and has requested the school authorities to raise the fees of the students of the first four classes by annas eight in each case and to increase the pay of the teachers as a condition of getting an increased minimum grant of Rs 150/- The authorities, we understand, have requested the department not to enforce the increase in the fee rate as most of the students come from the poorer classes, who will feel it a great hardship, if the fee-rates are increased. The authorities, we are sure will not deny the poor and the neglected teachers their due when the other departments have raised the scale of pay of their officers to make them efficient. The nation-building department should be given sufficient encouragement so that they may improve the condition of education; unless this is done whole-hearted work cannot be expected from the poor half-fed teachers who are compelled to engage themselves otherwise to make both ends meet at this time of economic difficulties.

আরাধনা

৬ষ্ঠ বর্ষ | APRIL TO JUNE. | ২য় সংখ্যা

পথের পথিক

শ্রীঅজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়—২য় শ্রেণী।

ভোরের বেলা আমি সে দিন দাঁড়িয়েছিনু পথে।
এই পথেতে চল্‌বে তুমি তোমার কনক রথে॥
দেখ্‌ব তোমার চলে যাওয়া।
লাগ্‌বে গায়ে তোমার ছায়া॥
কনক রথের ধূলি তোমার লাগ্‌বে আঁখির পাতে।
দাঁড়িয়েছিনু পথে॥
শতেক আঁখি দাঁড়িয়েছিল তোমার পথ চেয়ে।
শতেক কণ্ঠে উঠ্‌ল তোমার মঙ্গল গান গেয়ে॥
তুমি যখন এলে ধীরে ধীরে,
আমি তখন লজ্জানত শিরে।
দাঁড়িয়েছিনু তোমার পথে আঁখির আড়াল দিয়া
তোমার পথ চেয়ে।

প্রকৃত বন্ধু কে?

শ্রীহরেকৃষ্ণ কর—২য় শ্রেণী।

দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা প্রায়ই সমভাব ও সমমতাবলম্বী ব্যক্তির সহিত জন্মিয়া থাকে। মানব কখনও একা থাকিতে পারে না। পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে ভালবাসে। সে নির্জ্জনবাসকে কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতেও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে করে। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত। মানব যখন অতিশয় স্বজাতিপ্রিয় সে তখন যে সমভাব ব্যক্তির সহিত মনের বিশেষ ঐক্য হয় তাহার সহিত যে বন্ধুতা বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র কি? প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধুও তদ্রূপ মহা অনর্থের মূল। কপট বন্ধু প্রথমতঃ ছায়ার ন্যায় লোকের সুসময়ে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহৃদ্য প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই সর্ব্বনাশ করিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যে কত হইতেছে তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া নরকের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিজের আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে যৌবনে কোন অসৎ বন্ধুর উপদেশ অনুসারে এক সময় নরক অপেক্ষা নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছিলেন।

যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে, সম্পদে আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, আপনাকেও বিপদে ফেলিতে প্রস্তুত, তাঁহাকেই নীতিশাস্ত্রকারকগণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর কেহই নাই। কারণ মাতা পিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই জগতে এইরূপ আর কাহারও নিকট প্রাপ্ত হই না। আবার কোন কোন নীতিশাস্ত্রকার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

যথা ঃ— "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥"

উৎসব, ব্যসন, আর দুর্ভিক্ষ সময়।
শ্মশান, রাজদ্বার আর শত্রু ভয়॥
এসবে সহায় যার যেইজন হয়॥
সেজন তাহার বন্ধু জানিবে নিশ্চয়॥

এ সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারলৌকিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির বিষয়ে ইহা একেবারে কিছুই নয় বলিলেও হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্যপ্রভু এবং আমরা তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার চরণ-সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ছোটকাল থেকে পড়ে আসিতেছি যেঃ—

"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইনু।"

কেবল পড়িয়াই আসিতেছি, কিন্তু একথা বসে একটু চিন্তা করি না যে আমার জন্ম কি জন্য? যা'হ'ক তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর দেহে এই নশ্বর জগতে আসিয়াছি। মৃত্যুর পরও আমাদের আত্মার বিনাশ নাই, কর্ম্মফলবশতঃ নানা যোনিতে ঘুরিতে থাকিব। আমাদের এই মানব-জীবন অতি মহামূল্য ও দুর্লভ কারণ পশু পক্ষী ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুর্লভ মানব-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। এগুলি যে কেবল কল্পনামাত্র তাহা যেন কেহ মনে না করেন, কারণ শাস্ত্র শ্রীভগবানেরই বাণী। যাহা হউক আমাদের এই মহামূল্য জীবন থাকা কালে আমরা একবার সেই শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইনা কেন? যাহা প্রকৃত আমি তাহা পঞ্চভূতাত্মক দেহ নহে তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মার স্বভাবই শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা। অস্তিত্ব ক্ষণকাল স্থায়ী, মনুষ্যের মৃত্যু হইলেই সব শেষ হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান, ইহার তুলনায় মানব-জীবন অল্পকালস্থায়ী, শ্রীভগবানের শরণাপন্ন না হইলে অনন্তকাল ব্যাপিয়া ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া, সংসার রূপ মোহসাগরে হাবুডুবু খাইতে হয়, তাই

বলি যিনি ভগবৎ ভজনে সহায় হন, সদুপদেশ দ্বারা মানসিক জড়শক্তি কাটাইয়া দিয়া শ্রীভগবানোন্মুখ করেন তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আর যাহারা উপকার বা উপদেশ দ্বারা আমাদের বন্ধন বৃদ্ধি করিয়া ভগবানোন্মুখতা হ্রাস করিয়াছেন, তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নয়, এমন কি পিতা, মাতা, গুরু প্রভৃতি আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন যদ্যপি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীভগবৎ ভক্তি হইতে বঞ্চিত করেন। যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঃ—

"গুরুর্ন সস্যাৎ স্বজনো ন সস্যাৎ
পিতা ন স্যাজ্জনী ননা স্যাৎ
দৈবং নতৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স সস্যাৎ
ন মোচয়ে সমুপেত মৃত্যুম্।"

ভক্তি উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, সেই গুরু গুরু নহেন, সেই স্বজন স্বজন নহেন, সেই পিতা পিতা নহেন সেই মাতা মাতা নহেন এবং এরূপ নামে পরিচিত হওয়া উচিত নহে।

যা' হ'ক যিনি পরমার্থের পথ প্রদর্শনে সমর্থ হন না সেরূপ মানবের সহবাস করা উচিৎ নহে। আর যিনি আমাদের পরমার্থের পর্থ প্রদর্শন করাইয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যান, তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু পদবাচ্য, আর সেইরূপ বন্ধুর সহবাসে থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তি দাতা॥



গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ—৩য় শ্রেণী।

প্রকৃতির নব ভাব মধ্যাহ্ন সময়।
সূর্য্যের যৌবন যবে প্রকটিত হয়॥
নিস্তব্ধ নিঝুম ভাব ধরে চারিদিক।
প্রচার করেন নিজ তেজ অনিমিখ্॥
গোচারণ মাঠে গাভী নাহি দেখা যায়।
রাখাল ঘুমায় সুখে গাছের তলায়॥
মাঝে মাঝে ঝিঝি পোকা করে ঝি ঝি রব।
থেকে থেকে কোকিলেরা করে কুহু রব॥
পথিক হইয়া শ্রান্ত বিশ্রামের তরে।
ছায়াযুক্ত স্নিগ্ধ স্থান সদা খোঁজ করে॥
মৃদুমন্দ সমীরণ বহে ধীরে ধীরে।
শীতল করয়ে সেই সুপ্ত পথিকেরে॥
যাহার নিয়ম আর বিধান কৌশলে।
কলের নিয়মে রবি শশী সদা চলে॥
হে মানব, চিন্তা কর সেই ঈশ্বরেরে।
হবে না করিতে তবে পরিতাপ পরে॥

A scene from a hill.

(Bejoychandra Ghosh, teacher)

One fine morning I awoke and heard somebody was knocking at the door from outside. I enquired who he was. In mixed Hindi and Kole he replied "Babu, I am Jamal, will you not climb the hill this morning ?" I called my idiot boy-servant up and advised him to open the door. Jamal stepped into the room and sat on the floor with his long bow in his hand. Jamal was a Kole of Brobdingnag size. I have seldom come across such a figure in my life. Giving necessary directions to my 'Simple Simon' I walked towards the hill with two Koles. The hill appeared to be within stone's throw of my bungalow, but practically I found that it was about a mile off. We crossed a stream flowing down a hill, in which innumerable small silvery fish were frisking about. They were as gay and restless as the children of the Koles. We then reached the foot of the hill. The sky was free from clouds and the Sun peeping from his chamber in the eastern horizon ; nature assumed her most cheerful aspect. We began to wind up the hill. As there was no regular path and as the hill was of a precipitous nature I had to struggle hard to climb, but that was not the case with my attendants ; they climed the hill as easily as we walk over the plain. After a good deal of troubles, dragging my weary limbs, I got on the top of the hill. As soon as I stretched my eyes all round, it seemed to me that nature had revealed to me all at once her stored-up magnificence and solemnity. It appeared to me as if I had been transmitted to a fairy realm by some magical influence. For the time being I forgot my identity, continuous lines of hills

of unequal height, with spontaneous verdure, bathed in the golden rays of the rising sun looked like in surmountable walls of never-ending length. The more I looked at them the more I was puzzled. The shades of lofty hills shadowed the hills of lesser heights. Alternate light and shade on the summits of the hills, teeming with wild fertility, looked like motionless waves of the deep. It seemed to me, as if the undulating billows of tremendous size, in course of their rolling suddenly stopped to gaze at the beauty of the eastern sky. My feeble imagination fails to conjure up the sublimity and grandeur of the scene.

কাক ও কোকিল

শ্রীদুর্গেশমোহন দে, ৩য় শ্রেণী।

কোকিল কাককে বলে, "আমি কুহু ডাকি
মানবের চিত্তে সদা সুখ দিয়া থাকি।
বাসনা কতই দেই মনে জাগাইয়া,
সমস্ত মানবে শুধু তুলি মাতাইয়া।"
কাক বলে নম্রভাবে, "হে কোকিল ভাই!
সুদিনে আদর, পশু-বিলাসীর ঠাঁই।
আমি যেই ডাক দেই, সেই দেয় তাড়া,
দুঃসময়ে আমি আছি বোঝে না তাহারা।"

মানবতার মূল্য

মুজিবর রহমান, চতুর্থ শ্রেণী।

(১)

জগৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে মানুষের জন্ম। মানুষ পৃথিবীতে আসে, আবার সময় শেষ হইলে মানুষ বিশ্বের অণু-পরমাণুতে মিশিয়া যায়। এই চরাচরে—এই যে অনাদিকাল আসা-যাওয়া, এই আসার পূর্ব্বাংশ অনন্ত এবং যাওয়ার পরের অংশও অনন্ত। এই দুই অনন্তের মাঝে যে জীবন-সেতু ব্যবধান—এই জন্মান্তরের ভিতর যাঁহার যেরূপ কৃতিত্ব—তাঁহার জীবনের দামও তদ্রূপ বেশী।

(২)

মানুষ বাঁচিয়া থাকিয়া পরিসমাপ্তির পূর্ণ আনন্দ পাইতে হইলে এই জীবনের পথে সাধনার আবশ্যক। যাঁহার সাধনা সার্থক হয়—তিনি চির-স্মরণীয় মনীষী। আর যাঁহার সাধনা ব্যর্থ হয়—তাঁহার জীবনলয়ের অব্যবহিত পরেই স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইতে থাকে, ইহা এই দুনিয়ার চিরন্তন রীতি।

(৩)

অভিজাত বলিয়া মানবজাতির আর একটা জন্মগত সম্পদ আছে, যাঁহার প্রভাব প্রতিধ্বনিতে প্রবাহিত—এই সম্পদ যাঁহার আছে—তিনি বিনা চেষ্টায় সমাজ-পতি হন। যাঁহার এই বাঞ্ছিত সম্পদ নাই—তাহার জন্ম হুকুম মানিতে। একজন আজীবন সম্মান ভোগ করে, বিনা চেষ্টায় অন্য জন আজীবন সম্মান দান করে; একজন শাসক আর এক জন শাসিত। অথচ এই জন্ম গত সংস্কার অভিজাতের উপর মানুষের কোন হাত নাই।

(৪)

এই দৈবের লিখন খণ্ডন করাইতে মানুষকে অনেকখানি শিক্ষালাভ করিতে হইবে। মানবতার দাম বহুগুণে বাড়াইতে হইবে। তবেই তাহার মুক্তি।

(৫)

সুতরাং এই জন্ম-মৃত্যুর মাঝে—যিনি পরবর্ত্তী মানব-সমাজের অন্তর মাঝে—স্মৃতির একটী অবিনশ্বর দাগ রাখিয়া মরণ বরণ করিতে পারেন—তাঁহারই মৃত্যু সার্থক, তিনি মরিয়াও পরিসমাপ্তির অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। মানবতার দাম তাঁহারই মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজমান। অতএব মানুষ হইয়া—মনুষ্যত্ব পূর্ণ বিকশিত করিতে—অফুরন্ত ও জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন; নতুবা অনন্ত ব্যর্থতা বুক জোড়া বেদনা অবশ্যম্ভাবী।

অবসান

শ্রীপরিতোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১ম শ্রেণী।

স্তব্ধ হয়েছে সব কোলাহল—
আজি মোর রণ শেষ
শ্রান্তিকাতর জর জর হিয়া
ধূলায় মলিন বেশ
খুলে না ত মোর দেহ হ'তে আজ
এ কঠোর রণ-সাজ—
আর যে এ ভার বহিতে না পারি
এ' নীরব সাঁঝে দাও মুক্ত করি,
মুখ বুজে আমি সবই ত করেছি
দিবসের যত কাজ
ছেড়ে দাও এবে সব দায় হ'তে—
হে মহান্ বিশ্বরাজ!

চারিভিতে মোর ছেয়ে গেছে ঐ
নিরাশার কালো ছায়া—
উৎসাহ দীপ নিভে গেছে মোর
কেটেছে কুহক ঘোর
সুখ শান্তি মোর গেছে হারাইয়া
কেটে গেছে সব মায়া।
শ্যামল ধরণী নহে আজ ওগো
সুন্দর মম চোখে
হিয়া দগদগি না জুড়ায় আর
নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে
কোকিলের মুখে মধুর বারতা—
অরুণ প্রভাতে বিহগের গাঁথা

ঢালে না হৃদয়ে শান্তির ধারা
আকুল আমার বেশ
অবশ হৃদয়ে ছেয়ে গেছে শুধু
সকল রকম ক্লেশ।
ওগো—সকল রকমে রিক্ত করিয়া
কাঙ্গাল করগো মোরে
আপনার ভার সহিতে না পারি—
যত কিছু মোর নিয়ে যাও কাড়ি
আপনার মনে যেতে দাও মোরে
বেঁধো না মায়ার ডোরে।
আমি চাই শুধু ডুবিয়া থাকিতে
অনন্ত ঘুমের ঘোরে।

জাগরণ কালে সাড়া যেন কভু
নাহি দেয় হিয়াখান্
বিস্মৃতির কোলে সুখে ঘুম্ ঘুম্
থাকুক কেবল নীরব নিঝুম।
শান্তি সুখ সব—দূরে চলে যাক্
রাগ, দ্বেষ, অভিমান,
আমি শ্রান্তি-কাতর শূন্য পরাণে
চাহি শুধু অবসান॥
(প্রভো !) মঙ্গল-সুধা আশিস্ বরষি
কর মোরে পরিত্রাণ।

পাড়েরহাটের ডাইরী।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ—৩য় শ্রেণী।

অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল সমুদ্র বা অন্য কোন বড় নদী দর্শন করি। কিন্তু সে সুযোগ কোনও দিন ঘটে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার মঘিয়ায় গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম আমার এক মাতুলের বিবাহ হইবে, আরও জানিলাম পথে অনেক বিস্তৃত নদীর উপর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। যাইবার জন্য প্রস্তুত যইতে আরম্ভ করিলাম। মনে করিলাম হৃদয়ের আশা পূর্ণ করিবার এ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিব না।

অদ্য ১৩৩৬ সালের ২৪শে ফাল্গুন। অদ্যই বিবাহ। বিবাহ-বাসর পাড়েরহাট। ভোর ছয়টায় অনাহারে সকলের অগ্রে অদম্য আশা বুকে লইয়া নৌকায় উঠিলাম। প্রথমতঃ ভৈরব নদ দিয়া নৌকা চলিতে আরম্ভ করিল। ভৈরব কচুয়ার নিকট যেখানে বলেশ্বর নদের সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে নৌকা আসিল। এই বলেশ্বর নদ খুলনা জিলার পূর্ব্ব সীমা। নৌকা চলিতে লাগিল। কচুয়া দূর হইতে দূরতর হইয়া অবশেষে আকাশের গায়ে মসিরেখাবৎ মিলিয়া গেল। নদীর বাঁকের পর বাঁক অতিক্রম করিতে লাগিলাম, এক একটী বাঁক ২ মাইল ৩ মাইল লম্বা। অবশেষে বনগাঁয়ে উপস্থিত হইলাম। ইহা একটী গণ্ড গ্রাম, বাসুকী কুল গামার বর্ণিত রায়বংশ এই স্থানে জমিদারী করেন। গ্রামের ঘাটে নদীতে একখানি Police-steamer নঙ্গর করা রহিয়াছে। একটী লোক কি কারণে ৩।৪ জনকে হত্যা করিয়াছিল। পুলিশ তাহার তদন্তে এখানে আসিয়াছে। আরও ৩টী বাঁক অতিক্রম করিয়া বাখরগঞ্জ জিলার পিরোজপুর নামক মহকুমায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের রাস্তাগুলি পাকা না হইলেও উচু ও সর্ব্বদাই শুষ্ক। পাকা বাড়ী এদিকে খুব কম দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ঘর কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত ও রং করা। এখানে একটী স্কুল, আদালত ও থিয়েটার ঘর আছে। দামোদর নামক একটী কাঁটা খাল এই মহকুমার মধ্য প্রবেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বলেশ্বর ও কচা নামক দুইটী প্রকাণ্ড নদীকে সংযুক্ত করিতেছে। খালের উপরে একটী প্রকাণ্ড পুল উভয় তীরকে সংযুক্ত করিয়াছে। এখানে ৫।৬ খানি আবগারী দোকান দেখিলাম। বোধ হয় এ স্থানের অধিবাসীরা একটু বেশী রকম নেশাখোর। খালটীর দৈর্ঘ্য ৫॥ মাইল, বিস্তার ৬০ হস্ত। একটী খালি বাসায় খেচুড়ী রন্ধন করা হইল। আহারান্তে ৩॥ টার সময় পাড়েরহাটাভিমুখে রওনা হইলাম। এদিকে পুলের সংখ্যা খুব বেশী। রাস্তাগুলি বেশ ভাল। এদিকে হিন্দুর বসতি মোটেই নাই। সব মুসলমান। একটি বৃক্ষে অনেক বাদুড় ঝুলিতেছে। কয়েকটী লোক বৃক্ষতল হইতে নানাবিধ ফল কুড়াইতেছে।

নৌকায় একস্থানে বসিয়া থাকা আর ভাল লাগিল না। তিন জন কূলে উঠিয়া পথ বাহিয়া চলিলাম। একটি পুলের নিকট তিন খানি নৌকা বাঁধা রহি-

য়াছে। একজন মাঝি বলিল তাহার আরোহী তাহাকে ৬৲ টাকা ভাড়ার পরিবর্ত্তে ২৲ টাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আবার নৌকায় উঠিলাম। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় পাড়েরহাটে উপস্থিত হইলাম। পাড়েরহাটের পার্শ্বেই বিস্তৃত সলিলা কচানদী প্রবাহিতা। এই হাটটী প্রায় ¼ মাইল দৈর্ঘ্য ও২০০ হাত বিস্তৃত। রবি ও বুধবারে এই হাট মেলে। এখানে সর্ব্বদা সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। হাটের ভিতর একখানি ঘরে আমার অপরিচিত কয়েকটী দেব দেবীর মূর্ত্তি। ইহারা মৃত্তিকা নির্ম্মিত। সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় দিতেছে। একটী লোমাবৃত মূর্ত্তি বক্ষ চিরিয়া কি দেখাইতেছে। অনুমান করিলাম ইনি হনুমান। বুক চিরিয়া রামনাম দেখাইতেছেন। এক পাড়ে উপাধিধারী মাড়োয়ারী এখানে কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বংশধরেরা এ স্থানের ভূস্বামীস্বরূপ। তাঁহাদের আয় সদর খাজনা বাদে ২৫০০০৲ টাকা। বাড়ীতে অত্যুচ্চ দ্বিতলবিশিষ্ট দুইটী দালান, ইহা ব্যতীত ৩ খানি টিনের ঘর। পাড়েদিগের নামানুসারে এই স্থানের নাম পাড়েরহাট হইয়াছে। একটী নিরামিষ অতিথিশালা আছে। বাড়ীর ভিতর একটী নির্ম্মল সলিলা দীর্ঘিকা। সম্প্রতি ইহাদের বাড়ীতে তিনটী লোকের বসন্ত হওয়ায় সেখানে আমাদিগকে যাইতে দেয় নাই। পাড়েরহাটে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

অদ্য ২৫শে ফাল্গুন। সকাল বেলা পায়খানায় যাইব বলিয়া কচানদীর তীরে গেলাম। এত বড় নদী আমার জীবনে আর দেখি নাই। উহা রূপসা হইতে প্রায় ৩৷৷ তিন গুণ বিস্তৃত। এখানে একটী ত্রিমোহনা।

যাঁহারা কোন দিন সমুদ্র দেখেন নাই; তাঁহারা এই ত্রিমোহনা দেখিলে অনেকটা সমুদ্রের বিষয় কল্পনা করিতে পারেন। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ঘোলাটে জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে। নদী এত পরিসর বিশিষ্টা হইলেও গভীরতা তত বেশী নহে। ৫০।৬০ হস্ত দূর হইতেও লোকে নৌকা ঠেলিতেছে। লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া এত বড় নদী পার হইতেছে।

যাহা হউক আমি পায়খানায় যাইবার জন্য ঘটীতে জল আনিবার জন্য নদীতে

গিয়াছি এমন সময় সঙ্গীদ্বয় কুমীর! কুমীর! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তখন "চাচা আপনা বাঁচা" এই নীতির অনুসরণ করিয়া দে দৌড়। উপরে যাইয়া দেখি একটী ভয়ঙ্কর জন্তু জল ছিটাইতে ছিটাইতে ছুটিতেছে। শুনিলাম এই মহাপ্রভু নাকি আহারের জন্য মৎস্য শিকারের অভিপ্রায়ে চলিয়াছেন। আর নীচে যাইতে সাহসে কুলাইল না। কারণ মহাপ্রভু আবার কখন আইসেন তাহার ঠিক কি? অন্য একটী লোক যাইয়া জলপাত্রটী লইয়া আসিল।

নদীর তীরে অসংখ্য বাবলা বৃক্ষ। এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে তাহা দেখিয়া বাদাবন ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না। এখানে উমেদপুর নামক একটী ষ্টীমার ষ্টেশন আছে। এইরূপে হৃদয়াশা কতক অপূর্ণ রাখিয়া বাড়ীতে ফিরিতে হইল। কারণ বড় নদী দিয়া আমাদের অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় নাই।

অভয় চরণ

শ্রীহরেকৃষ্ণ কর—২য় শ্রেণী।

এখন বুঝিনু প্রভু, তোমার চরণ।
অশোক অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তাই ও পদ যুগলে,
পড়িয়াছি আসি নাথ বড় কুতূহলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার,
আমার পালন ভার এখন তোমার॥

মোছাফিরের ডায়েরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবিজয়চন্দ্র ঘোষ, শিক্ষক।

খানিকটা এসে কোচ্‌ম্যান আর কোন প্রকারে ঘোড়াকে চালাতে পারে না। ক্রমাগত চাবুক মেরেও সে ঘোড়াকে সম্মুখে হাকাতে পারিল না। সে একদম বেঁকে বস্‌ল। আমরা অনন্যোপায় হ'য়ে কোচম্যান্‌কে ব্রহ্মজৈন্‌ পাহাড়ের নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে হাট্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। বেলা বারটার সময় আমরা ব্রহ্মজৈন পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হলাম। এইটী গয়ার মধ্যে সব চেয়ে উঁচু পাহাড়। উঠবার জন্য সুন্দর সিঁড়ি করে দেওয়া আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। এদিকে হেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাতে আবার প্রখর রৌদ্র বড়ই কষ্ট হ'তে লাগল, পণ্ডিতজী স্থূল দেহ নিয়ে বড়ই বিপদে পড়ে গেলেন, কিছুদূর উঠেন আর হাপিয়ে পড়েন, মাঝে মাঝে বিশ্রাম ক'রে ধীরে ধীরে পাহাড়ের শিখরদেশে আরোহণ কর্‌লাম। দেখ্‌লাম একটী বৃদ্ধা একখানা লাঠির সাহায্যে অত উঁচু পাহাড়ে উঠে গেল। উঠ্‌তে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয়েছিল বটে কিন্তু উপরে গিয়ে চারিদিকে তাকালে সব ক্লান্তি দূরে গেল। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বদিকে দূরে ফল্গুনদীকে একটী ক্ষীণ রজতরেখার ন্যায় দেখায়। পশ্চিম দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ এবং মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বন, পাহাড় ও জলাভূমি দেখা যায়। পাহাড়ের শিখরদেশটী একটী table land এর মত। তার উপর সুন্দর একটী মন্দির আছে, মন্দিরের মধ্যে সাবিত্রী দেবীর বিগ্রহ আছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা নাম্‌তে সুরু কর্‌লাম। মাঝে পর্ব্বতগাত্রে ছোট একটী কুণ্ড (অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়) দেখ্‌তে পেলাম। অনেক নিম্নে জল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেওলা আছে, অত উঁচুতে পাহাড়ের উপর কি করে শেওলা জুট্‌ল বুঝলাম না। যা' হোক নাম্‌তে বিশেষ কষ্ট হল না। নীচে এসে কোচ্‌-

ম্যানের খোঁজ করলাম কিন্তু তার কোন পাত্তা পেলাম না। আর এক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে main road এর উপর এসে দাড়ালাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গাড়ীর কোন সন্ধান না পেয়ে হাট্তে আরম্ভ করলাম। একে পাহাড়ে উঠে এবং নেমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাতে আবার দুপুরের প্রখর রৌদ্র। এদিকে পেটেও বিশেষ কিছু পড়ে নি; কাজেই অত্যন্ত অবসন্ন দেহে ধীরে ধীরে ধর্ম্মশালায় এসে উপস্থিত হলাম। তখন বেলা ৩টা বেজে ১৫ মিনিট হয়েছিল। একটু বিশ্রাম করে স্নানান্তে কিছু খেয়ে নিলাম। গয়ার জলটা বেশ ভাল, খাদ্যাদিও মোটের উপর মন্দ পাওয়া যায় না। মিষ্টান্ন ত ভালই পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীবৃন্দাবন ধাম ছাড়া আর কোথাও আমরা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সুবিধা করতে পারিনি; প্রত্যেক জায়গাতেই ও বিষয়ে বেশ অসুবিধা ভোগ করেছি, সেটা অবশ্য অধিকাংশ স্থলে নিজেদের দোষে। পণ্ডিতজীর অনভিজ্ঞতা এবং গোড়ামী তার প্রধান কারণ।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।—পূর্ব্বদিন যখন আমরা পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান কার্য্য শেষ করে ফিরে আসি সেই সময় একটী খাবারের দোকানে বসে কিছু জলযোগ করেছিলাম। সেখান থেকে আসবার সময় পণ্ডিতজী তাঁর বহুদিনের প্রিয় সহচর পাষণ্ড দলনকারী খর্ব্বাকৃতি একখানা বেতের লাঠী ফেলে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য আমাদের ভ্রমণ কালে আমরা যখন যেখানে গিয়াছি পণ্ডিতজী অন্ততঃপক্ষে একবার তাঁর প্রিয় সঙ্গীর কথা উল্লেখ করে দুঃখ করেছেন। ঐ দিন বিকাল বেলা ৫টা ১০মিনিটে 19 up trainএ গয়াধাম ত্যাগ করিলাম।

আমরা একটী দুঃখের স্মৃতি নিয়ে গয়াধাম ত্যাগ করেছিলাম। যে কোচম্যান আমাদিগকে বুদ্ধগয়ায় লইয়া গিয়াছিল তার আর কোন সন্ধান পাইলাম না। তার প্রাপ্য ভাড়াটা তাকে না দিতে পেরে আমরা বিশেষ অশান্তি ভোগ করেছিলাম। পণ্ডিতজী সর্ব্বদাই তার কথা বলতেন, দেশে ফিরে এসেও তার কথা অনেকবার বলেছিলেন। অবশ্য শেষে অন্য প্রকারে আমরা তার ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। তারপর যা বলছিলাম। ৫টা ১০ মিনিটের ট্রেনে চেপে রাত বারটার

সময় আমরা মোগলসরাইতে পৌছিলাম। গয়া থেকে মোগলসরাই ১২৬ মাইল। গাড়ী যখন সোন্ bridgeএর উপর দিয়ে যায় তখন ঘড়ী ধরে দেখলাম নদী পার হতে প্রায় ৬ মিনিট লাগ্‌ল। মোগলসরাইতে আমরা বেশীক্ষণ থাকি নাই। রাত ৩টা ৫৫ মিনিটে Moghalsarai Lucknow Passenger এ চেপে প্রাতে ৯টা ২২ মিনিটে অযোধ্যায় পৌছিলাম। অযোধ্যা হাওড়া থেকে ৫৪৬ মাইল। শ্রীরাম-চন্দ্রের দেশে পৌছে মনে ভারী আনন্দ হ'ল। অযোধ্যায় যাওয়ার পূর্ব্বে কল্পনায় অযোধ্যার কত ছবি যে এঁকেছি তা বলে শেষ করতে পারি না। কিন্তু হায় ভগবান্! যেয়ে দেখি 'সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।' আছে প্রকাণ্ড লাঠী-ধারী গুণ্ডার সর্দ্দার পাণ্ডা আর অসংখ্য বানর। একটু অসামাল হলে আর রক্ষা নাই। ষ্টেশনে নেমে দেখি পাণ্ডা প্রভুরা হাজির। মড়া দেখলে যেমন শকুনি এসে জুটে সেইরূপ যাত্রী দেখলে (বিশেষতঃ বাঙ্গালী যাত্রী) পাণ্ডারা এসে ঘিরে দাঁড়ায়। তারা মনে করে বাঙ্গালী পাঁকা কাঁঠাল। কোন প্রকারে কাটাযুক্ত আব-রণটী সরাতে পারলেই রসাল কোয়া মিল্‌বে। কিন্তু জানে না কোন কোন কাঁঠালে এত আটা বেশী যে তা ছাড়াতে পৈতৃক গোপ দাড়ী পর্য্যন্ত হারাতে হয়। অযো-ধ্যার পাণ্ডার কাহিনী এবং কীর্ত্তি অনেক আছে, তার দুই একটী না বলে পারছি না। যখন দেখলাম এদের একটীর শরণাপন্ন না হলে এ সব vultureএর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নাই তখন একটী বেছে নিলাম। তখন আর পাণ্ডা-গুলি অগত্যা রণে ভঙ্গ দিল। তাদের মধ্যে একজন অনুচ্চ স্বরে বলিল "বাবু পরে বুঝবে", তার কথা তখন আমরা কিছু গ্রাহ্য করলাম না, কিন্তু পরে বেশ ভাল রকমই বুঝেছিলাম। আমরা পূর্ব্বে সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলাম যে ষ্টেশনের কাছে ভাল বড় ধর্ম্মশালা আছে। পাণ্ডাকে বলিলাম আমাদিগকে সেই ধর্ম্মশালায় নিয়ে চল। কিন্তু ধূর্ত্ত পাণ্ডা একখানা এক্কা করে চির পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় নানা-রূপ অযাচিত মোলায়েম উপদেশ দিতে দিতে কোথায় নিয়ে চল্‌ল সেই জানে। কিছুদূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কতদূর নিয়ে যাচ্ছ! ষ্টেশনের কাছে ধর্ম্মশালা তুমি কতদূরে নিচ্ছ।" সে বলে "এই বাবু থোড়া দূর।" শেষে দেখি কোথায়

ষ্টেশন পড়ে রইল; অনেক রাস্তা গলি ঘুরে একটী জীর্ণ বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইল। আমরা নাম্‌লে ক্ষিপ্রহস্তে আমাদের জিনিষপত্র নামাইয়া দিল। এক্কাওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া তার পিছু পিছু বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লাম। বাড়ীর অবস্থা দেখে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! অতি বিশ্রী, পুরাতন নোংড়া একটা দ্বিতল বাড়ী চারিদিক থেকে একটা ভোট্‌কা গন্ধ আস্‌ছে। পাণ্ডাকে বলিলাম "এ কোথায় এনেছ? এই কি ষ্টেশনের কাছে ধর্ম্মশালা।" পাণ্ডা হিন্দি মিশ্রিত বাংলায় বলিল "আরে বাবু এ সরযূর কাছে ভাল ধরমশালা আছে, প্রত্যহ সরযূতে স্নান করবে।" তার সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা জেনে দ্বিতলে একটী বড় ঘর বেছে নিলাম। এই ধর্ম্মশালা দেখে গয়ার সেই প্রাসাদতুল্য সুরজমল ধরমশালার কথা মনে হলো। এই বাড়ীটী ডিটেক্‌টীভ উপন্যাসে ডাকাতের আড্ডা বর্ণনায় যে সব পুরাতন বাড়ীর কথা উল্লেখ আছে তদ্রূপ। কাজেও তাই পরে জানতে পাবে। কি আর করি তখন আর অন্য উপায় নাই, আমাদের জিনিষপত্রগুলি ঘরের ভিতর গুছিয়ে রাখ্‌লাম অবশ্য আমাদের মত হতভাগ্য যাত্রী আরও কয়েকজন সে বাটীতে ছিল। কিন্তু তার মধ্যে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার লোক একটীও দেখ্‌লাম না। বাড়ীর বারান্দাগুলি পর্য্যন্ত লোহার জাল দিয়া দৃঢ়রূপে ঘেরা। একটু ফাঁক পেয়েছে কি শ্রীরামচন্দ্রের চেলারা ঘরের ভিতর ঢুকে যা কিছু পাবে নিয়ে পালাবে। তারা যেরূপ চতুর সেইরূপ নির্ভীক। তা না হলে কি রামচন্দ্র তাদের সাহায্যে রাবণের ন্যায় দুর্দ্দান্ত এবং পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত এবং নিহত করিতে পারিতেন? ঘরে তালা দিয়ে আমরা বাজার করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম, সারা সকালটা অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের ধর্ম্মশালার একটু দূরেই বাজার। একটী দোকান থেকে কিছু দ্রব্যাদি খরিদ করার পর মূল্য দিবার সময় দোকানী নোটের change দিতে পারিল না। আমরা তখন বলিলাম। 'তা হলে আমাদের এ সব নেওয়া হ'ল না।" দোকানী আমাদের কথা শুনে কিছু অবাক্ হয়ে গেল, তার পর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলিল "কেন, জিনিষ লে যাও পরে মূল্য দেবে," আমরা কিছু বিস্মিত হ'লাম, আমাদের নাম জানে না, ধাম জানে না, কোথা থেকে এসেছি কোথায়

যাচ্ছি কিছুই জানে না অথচ বল্লে 'লে যাও'। আমাদের আর দ্বিতীয় কথা না বলে সে অন্য ক্রেতাদের দ্রব্যাদি দিতে আরম্ভ করিল। আমরা দ্রব্যাদি লইয়া ধর্ম্মশালায় রওনা দিলাম। আমাদের দেশের দোকানদারদের কথা একবার ভাবিলাম। ধর্ম্মশালায় দ্রব্যাদি রেখে সরযূতে স্নান করতে গিয়ে ভারি বিপদে পড়ে গেলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য কচ্ছপ কিলিবিলি করিতেছে, দেখে আমাদের আর নামতে ভরসা হয় না। আমাদের দেখে তীরের কাছে বহুসংখ্যক জমা হতে লাগল। তার এক একটা বিরাট আকারের। তাদের বিশাল দেহ এবং প্রকাণ্ড শুঁড় দেখে আমাদের স্নানের রুচি কমিয়া গেল। একজন সন্ন্যাসী একটু দূরে বসে আমাদের বীরত্ব লক্ষ্য করছিলেন। অবশেষে আমাদের অবস্থা দেখে ধীরে ধীরে কাছে এসে বল্লেন "কুচ ডর নেই বাপ, হামারা সাত আও," এই বলে দুই হাত দিয়ে সেগুলিকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নেমে পড়লেন। আমরা প্রাণটা হাতে করে শ্রীরামচন্দ্রের নাম করে তার অনুসরণ করলাম এবং কোন প্রকারে স্নানাদি সেরে নিলাম। পণ্ডিতজীর ব্রহ্মতেজও কচ্ছপের কাছে পরাভব স্বীকার করেছিল। ক্রমশঃ

ত্র্যহস্পর্শ

শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়—প্রথম শ্রেণী।

"আজি ত্র্যহস্পর্শের দিনে
যেয়ো নাকো বাপধন মোর কোনখানে;"
মা কেঁদে কয় অশ্রুজলে ভাসি
শুনি পুত্র কহে মৃদু হাসি,—
"এমন কথা শিখলে কোথা মাতা?
জান নাকি আমি বিলেত ফেরতা?

বিলেতের নব জ্ঞান-স্পর্শে
বদ্ধ আমি নহি ব্রাহ্মস্পর্শে ;
যে সংস্কারে বদ্ধ ছিলেম আমি,
দূর করেছে জ্ঞানালোকে প্রিয় বিলাতভূমি,
রাম রাম রাম
বিধি আমার বাম
(নইলে) বিলেত ফেরতার মাতা হয় এমনি নিরেট মূর্খ
স্থান নাই মোর রাখ্তে এমন দুঃখ।
অধঃপাতে যাক্‌গে এমন দেশ
নাই গো যেথায় একটু জ্ঞানের লেশ
অসভ্যের একশেষ।
নামটী আমার জগৎজোড়া
যদি তোমার কাণ্ডখানি পড়ে কোথাও ধরা
লজ্জায় হব আধ মরা।
হায়! কোথায় আজি প্রিয় বিলাতভূমি
জগৎ মাঝে শ্রেষ্ঠ ওগো তুমি
ধন্য হয় গো নরনারী তব পদ চুমি।"
মা কহিল ধীরে ধীরে তারে,—
"কি বল্‌ছ বাবা, এমন কোরে
আঘাতিয়া বাক্য-শেল মাতার অন্তরে।"
ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌ল পুত্র তারে,—
'জ্বালিয়ো না গো এমন ক'রে মোরে
বইছে আগুন আমার এ অন্তরে।
মূর্খ নারী, বুঝবে কিবা তুমি?
তোমায় মাতা ডাকতে সদা লজ্জায় মরি আমি।

নাহি জান মোটেই রীতি-নীতি
অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে বদ্ধ এই জাতি
"ত্র্যহস্পর্শ," "বারবেলা" এই ভাবে দিবারাতি।
ইংরাজ মহিলারা
ভাগ্যবতী তারা
রীতি-নীতি জানে তারা বেশ
নাই তাহাদের অন্তরেতে অজ্ঞতার লেশ।
বিলেতে নাহি গেলে
বিদ্যা বুদ্ধি হয় কি কোন কালে ?
সাধে ধাতা লিখে দিছে সুখ তাহাদের ভালে ?"
এই বলিয়ে হন্ হনিয়ে
চল্‌ল পুত্র দিল্লী অভিমুখে
বসে রইল মাতা শুধু অশ্রুজলে ভাসি অধোমুখে।
দর্ দর্ ধারে অশ্রু বহি পড়ে
বইল হায়, অশ্রুস্রোত ক্ষীণ কলেবরে।
দেখ্‌লে নাগো পুত্র তার মাতি অহঙ্কারে
কি বেদনা লুক্কায়িত মাতার অন্তরে।
সে যে মস্ত কুলাঙ্গার
বুঝে না যে মার কথাটীর সার
দুঃখের তার নাহি হবে পার।
মাতার অশ্রু পড়ে যেথা ঝ'রে
নিশ্চয় সে স্থান যাবে পুড়ে।
মাতা যদি দেন অভিশাপ
সে যে জ্বলে পুড়ে পাবে মনস্তাপ।
বুঝ্‌লে নাগো অহঙ্কারী ছেলে

দেখ্‌লে না সে চোখ দুটী তার মেলে
কি বেদনা সইল মাতা ভাসি অশ্রুজলে।
কিছুদিন পরে
এল একটি টেলিগ্রাম মাতার স্নেহ করে
দেখ্‌লে খুলে মাতা তাহা পড়ে,—
পুত্র তাহার ভীষণ জ্বরে দিল্লী নগরে
দেখ্‌তে চায় গো পুত্র তারে
শুধু একটি বারের তরে।
চলেন মাতা দিল্লী অভিমুখে
অমঙ্গলের বাঁশী বাজে ধীরে তাঁহার বুকে
চল্‌ল মাতা বদ্ধ হয়ে দুখে।
দেখ্‌ল তাঁহার পুত্র আছে পড়ে
একটি ধবল নির্ম্মল পালঙ্কপরে
মা কেঁদে কয় হাত বুলাইয়া শিরে,—
"কোথা যাবি বাবা আমায় ছেড়ে?"
মেলি আঁখিদ্বয়
ধীরে ধীরে পুত্র তাহার মাতার প্রতি চায়
পা দুটী তাঁর জড়ায়ে কয়,—
"পারবে না গো রাখ্‌তে মোরে হায়
যাচ্ছে চলে প্রাণটী আমার ছাড়ি এ পাপ কায়।
ক্ষমা কর জননি গো! আমায় এই বেলায়।
পাপের আমার নাই গো পারাপার
হতভাগা, আমি মাতা মস্ত কুলাঙ্গার।
অহঙ্কারে মত্ত ছিনু সদা
শুনি নাই গো বাক্য তব কদা।

বড় মহাপাপে
দারুণ মনস্তাপে
চল্‌ছি মাতা যমের তাড়নে
রেখো মাতা অভাগারে মনে।
বিলেত ফেরতা হয়ে
প্রবেশিল গর্ব্ব মোর ক্ষুদ্র হৃদয়ে
তাই তোমা হেন মাতৃদেবীরে
চিন্‌তে নারি কোন দিনের তরে
ক্ষমা কর এই বেলাটী মোরে।
হিন্দুদের শাস্ত্র পুরাণ কথা
তুচ্ছ করি কত রকম দিয়েছিনু তোমার মনে ব্যথা।
আজ খুলে দিল বন্ধু শমন মোর
অন্তরালয়ের কঠিন রুদ্ধ দোর
চেয়ে দেখি সেথা মাতা অন্ধকার ঘোর
(হঠাৎ) জ্বলে উঠ্‌ল একটি প্রদীপ না হইতে ভোর
চেয়ে দেখি অতি শুভ্র হৃদয়খানি মোর।
সেদিন ত্র্যহস্পর্শের দিনে
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে শাস্ত্র নাহি মেনে
অবজ্ঞার ভরে তব বাক্য নাহি শুনে
চলে এলাম হন্ হনিয়ে দিল্লী অভিমুখে।
বুঝি নাই গো কত অশ্রুপাত
করেছিলে তুমি দিবারাত।
হিন্দুদের শাস্ত্র পুরাণ যত
মনে হ'ত স্বার্থপরের তুচ্ছ কথার মত
আজ আমার সে ভুল ধারণা গত।"

তারপর সব হয়ে গেল শেষ
ব্যক্ত করি গেল পুত্র অনুতাপের যতখানি ক্লেশ
শূন্য করি দুঃখরাশির লেশ।
মাতা শুধু বসে রইল দুঃখরাশির মাঝে
ভাবলে শুধু হিন্দুদের শাস্ত্র নহে মিছে
মহাসত্য তাহার মধ্যে আছে।

কয়েকটী ছোট গল্প

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়চৌধুরী—শিক্ষক।

বালকগণ গল্প শুনিতে ভালবাসে— আজ তাই তাহাদিগকে কয়েকটী ছোট গল্প শুনাইব। ইহা দ্বারা তাহাদের মানসিক সদ্বৃত্তিগুলির স্ফূরণ হয় ইহাই আমার ইচ্ছা। প্রত্যেক গল্পেই একটী অন্তর্নিহিত নীতি আছে। বালকগণ তাহা খুঁজিয়া বাহির করে এবং জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তে ইহা লক্ষ্য করে দেখিতে পাইলে লেখক সুখী হইবেন।

"Silence is Golden."

"পরিমিত বাক্য কথন উপকারী"

সংসারে সাধু ব্যক্তিরা সাধারণতঃ মিতভাষী থাকেন। আবশ্যক হইলেও বেশী কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এক সময় একজন মহাপুরুষকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—এই বক্তৃতার যুগে আপনি চুপ করিয়া থাকেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন—"সত্য বলিলে জগতের অপ্রীতি; মিথ্যা বলিলে ভগবানের অপ্রীতি—চুপ করিয়া থাকিলে সকলের প্রীতি লাভ হয়, এজন্য প্রায় সকল সময় চুপ করিয়া থাকাই ভাল মনে করি। অধিক কথা বলিলে আয়ুক্ষয় হয় ইহাও চুপ করিয়া থাকিবার অন্যতম কারণ।"

বিপদের মাঝে সদা রাখ মোর স্থান;
বিপদ সহিতে শক্তি দিও ভগবান।

সাধু পওহরি বাবার নাম তোমরা অনেকেই শুন নাই। তিনি সাধু মহাপুরুষগণের মধ্যে একজন প্রধান। এক সময় তাঁহাকে সাপে দংশন করে। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। শিষ্যগণ অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হন। কিন্তু তিনি বলেন—"এটী প্রেমময় ভগবানের দূত। আমাকে ইহাদ্বারা দংশন করান তাঁহার ইচ্ছা।" সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি সর্প দংশন যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। দুঃখ ভগবান প্রদত্ত আশীর্বাদ এরূপ ধারণা থাকিলে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট থাকে না।

বালকগণ, গ্রীস দেশের দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটীজের নাম সকলেই শুনিয়াছ। তিনি জনসাধারণকে ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান. রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন, এবং ক্রমে বিশেষ যশস্বী হন। ক্রমে ক্রমে বহু লোক তাঁহার শিষ্য হয়। ইঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ইঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করে। শত্রুপক্ষ ইঁহার বিরুদ্ধে নূতন দেবতার প্রচলন, দেশের দেবতার প্রতি উপেক্ষা ও যুবকগণের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করার অপরাধ আনয়ন করেন। একটী বিচার প্রহসন করা হইল। অধিকাংশের মতানুসারে সক্রেটীজের বিষ-পানে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এজন্য তাঁহার শিষ্যেরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিন্তু তিনি ইহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন "আমার মৃত্যু—মঙ্গলময় ভগবানের সঙ্গে মিলন—ভগবানের ইচ্ছা। শরীর আমাদের শত্রু। ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা. তন্দ্রা, জরা, ব্যাধি নানাভাবে আমাদিগকে কষ্ট দেয়। এই শরীরনাশে—শান্তিময়ের সঙ্গে মিলন হইবে ইহাতে দুঃখ কি? বরং ইহাই মানব জীবনের পরম সুখ।" শিষ্যগণ তাঁহার এই উপদেশ দ্বারা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। আর তিনি—তিনি প্রসন্নবদনে হেমলক্ নামক বিষ পান করিয়া দেহমুক্ত হন। এখানেও আমরা দেখিলাম—যে দুঃখ দুঃখ নহে—ইহা প্রচ্ছন্নভাবে ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

ধর্ম্মজগতে দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের নাম এবং তিনি কিরূপ কঠোর শাস্তি অকাতরে ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা সকলেই জান। এ সকল

কঠোর শারীরিক যাতনাকে তিনি ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। পরে ভগবানের কৃপায় কি ভাবে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন ও দীর্ঘকাল ন্যায়ানুমোদিতভাবে প্রজা পালন করেন তাহাও তোমাদের অবিদিত নাই। দুঃখই সুখের নিদান—ইহা তিনি ভাল ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই মহাপুরুষ দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিশুখৃষ্টের নাম জগতে বিখ্যাত। সক্রেটীজের ন্যায় ইহাঁর বিরুদ্ধেও নূতন ধর্ম্ম প্রচারের দোষ দিয়া য়িহুদীরা ইহার প্রতি খড়্গহস্ত হয়। অবশেষে রাজদ্বারে তিনি অভিযুক্ত হন। পনটিয়াস্ পিলেট (Pontius Pilate) নামক বিচারকের বিচারে ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ক্রুস নামক যন্ত্রে প্রেক বিদ্ধ করিয়া ইহাঁকে ভয়ানক শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া মারিবার সময়ও তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবান, আমার শত্রুদিগকে ক্ষমা করিও—তাহারা না বুঝিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছে।" কি ক্ষমা, কি সহিষ্ণুতা! যিনি মানসিক শক্তিসম্পন্ন তাঁহার শারীরিক কষ্ট বোধ হয় না। এই মহাপুরুষের জন্মদিন হইতে খ্রীষ্টাব্দের গণনা আরম্ভ এবং ইহাঁর মৃত্যুর দিন Goodfriday নামে অভিহিত হয়।

চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য হরিদাসকে ধর্ম্মপ্রচার জন্য কাজির অনুরোধে নবাব বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। বেত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সমাধিস্থ হরিদাসকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা হয়। কিছু দূর ভাসিয়া যাইবার পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয়। তিনি তীরে উঠিয়া নবাবকে দর্শন দিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। নবাব বুদ্ধিমান্ লোক, তিনি বুঝিলেন হরিদাস খাঁটী সাধুপুরুষ। তখন তিনি তাঁহাকে ইচ্ছামত বিচরণের আদেশ দেন। সাধু পুরুষগণ সুখ দুঃখাতীত। তাঁহারা দুঃখই সংসারে সুখের নিদান ইহা বুঝিয়া দুঃখ বরণ করেন এবং দুঃখের মধ্যে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। শারীরিক যন্ত্রণায়ও যে দৃঢ়-সংকল্প সাধু পুরুষগণকে বিপন্ন করে না তাহার অনেক উদাহরণ আধুনিক সময়ে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে।

চৈতন্যদেবের আর একটী প্রিয় শিষ্যের কথাও তোমাদিগকে শুনাইব। বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ের মুসলমান নবাব হোসেন সাহের নাম বিখ্যাত। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর নাম সনাতন। জগতে সকলই নশ্বর ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজে সংসার ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা রূপও সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। অসুস্থ বলিয়া সনাতন রাজ-দরবারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। হোসেন সাহ লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইয়া জানিলেন যে তিনি অসুস্থ নহেন। গৌড়রাজ স্বয়ং তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অস্বীকার করায় কারারুদ্ধ হইলেন। সকলেই মনে করিল—সনাতনের বড়ই কষ্ট হইতেছে। সনাতন ভাবিলেন—ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ। ভগবান তাঁহার নাম নির্ব্বিঘ্নে চিন্তা করিবার সুযোগ সনাতনকে দিয়াছেন। তিনি কি ভাবে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন ও ধর্ম্মভাবে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই।

ভগবানের উপর যাঁহারা নির্ভর করিতে পারেন, তাঁহাদের কোনরূপ বিপদে ভীত হইবার কারণ হয় না। এ বিষয়ে একটী গল্প তোমাদিগকে শুনাইব। একটী ভদ্রলোক তাঁহার পত্নীসহ ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। ভূমধ্যসাগরে জাহাজ পৌঁছিলে আকাশে ঘনঘটায় মেঘ দেখা গেল। জাহাজ ডুবু ডুবু। স্ত্রী একটী কামরার মধ্যে ছিলেন, অত্যন্ত ভীতা হইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"দেখ্‌তে পাচ্ছ না, জাহাজ যে ডুবিয়া যায়—তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে চুপ করিয়া বসিয়া আছ!" স্বামী তৎক্ষণাৎ তাহার পকেট হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া স্ত্রীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন। স্ত্রী এ বিপদের সময়ও না হাসিয়া পারিলেন না। স্বামী তখন বলিলেন—"আমি পিস্তল দ্বারা তোমাকে হত্যা করিতে যাইতেছি—কৈ তোমার ত ভয় নাই।" পত্নী উত্তর করিলেন—"পিস্তল যে আমার প্রিয়তমের হস্তে, তোমার হস্তে মরিবার আশঙ্কা নাই— মরিলেও দুঃখ নাই।" স্বামী বলিলেন—"ঝড় তুফান ত ভগবানের হাতে। তিনি ত আমাদের প্রিয় হইতেও প্রিয়তম—তবে আর আমাদের ভয়ের কারণ কি?" স্ত্রী বুঝিলেন যে

মঙ্গলময়ের সকল কার্য্যেই মঙ্গল আছে। কাজেই ভীত হইবার আদৌ কোন কারণ নাই।
বালকগণ, এইবার তোমাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদের জীবনীর প্রথমাংশ শুনাইব। কত কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা শুনিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য, অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। তিনি যখন ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন মক্কাবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবকের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা করিতে ও বিশেষতঃ প্রচলিত দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে উপদেশ শুনিতে প্রস্তুত ছিল না। নানা রকম বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যখন হজরতের পিতৃব্য মহাবীর হাম্‌জা ও মক্কার জননায়ক ওমর ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন কোরেশগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হজরত ও তাঁহার অনুচরগণকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে পাগল বলিত, তাঁহার অঙ্গে মলমূত্র নিক্ষেপ করিত, কিন্তু মহাপুরুষ কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু কোরেশগণ তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ও রুষ্ট হইল। অগত্যা তাঁহার কার্য্য পণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মোহাম্মদ তখন অনন্যোপায় হইয়া পলাইয়া মদিনায় গমন করেন। এই মদিনা যাত্রার নাম হিজরত এবং হিজরী সনের এই সময় (৬২২ খৃষ্টাব্দ) হইতে গণনা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত মহাপুরুষগণকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য কঠোর কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। মনের বল থাকিলে শারীরিক অসুখে মানুষকে বিপন্ন করিতে পারে না। শারীরিক অসুখে সকলকেই ভুগিতে হয়। তাহা বলিয়া ম্রিয়মাণ হইলে চলিবে কেন? সাধারণ লোকের কথাত দূরের—মহাপুরুষগণের কথাই মনে কর। বুদ্ধদেবের পেটের পীড়া ছিল। শঙ্করাচার্য্য ভগন্দরে ভুগিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব সর্ব্বদাই জ্বরে ভুগিতেন; পরমহংস রামকৃষ্ণ গলক্ষতে দেহত্যাগ করেন। ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিলে মানুষ দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ মনে করিয়া সংসারের বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকে। বিপদ, কষ্ট মানুষকে সৎপথে লইয়া যায়। তবে বিপদে মুহ্যমান না হইতে হয় এরূপ শক্তি থাকা আবশ্যক। (বারান্তরে আরও কয়েকটী গল্প শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।)

নদীর শোভা

শ্রীসুশীলকুমার রায়চৌধুরী।

নদী বয়ে যায়। কল্ কল্, ছল্ ছল্—কতই না তার কথা—যেন ফুরায় না। দূরে দিগন্তের দিক্‌চক্রবালে, যেখানে নীলিমার সাথে শ্যামলিমার গাঢ় মাখামাখি। সূর্য্যি ডোবো ডোবো, তার ম্লান কিরণের এক বোঝা, গাছ গাছালির ছায়ার হাত এড়িয়ে কোন মতে ঠিক্‌রে এসে জলে পড়তে চায়; সব আকাশ-টাই সোণায় ভরা।

বাঁকের মাথায় দুটো পাঁজা, একটা আধভাঙ্গা আর একটা আভাঙ্গা—দুটোই এক সাথে লাগানো। বাঁকের মোড়ে একটা মস্ত-বড় বটগাছ, বাতাস যাচ্ছে আর পাতা নাড়াচ্ছে। তার পাশে ছোট্ট কুঁড়ে ঘর কতকগুল' আর একটা দালান, আধ ভাঙ্গা। চরে এক দল গরু চর্‌ছে, রাখালগুল' কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, কেউ গান গাচ্ছে, আর কতকগুল' যুবা খেলা কর্‌ছে। কয়টা গরু ঘাস খেতে নদীর যে চরটুকু বেড়ে নদীর মধ্যে চলে গেছে, এখনও জলে আধো ডোবা তারই পরে চলে গেছে।

বাঁকের মাঝামাঝি এক সব-রাঙ্গা একটা গাছে কৃষ্ণচূড়া ফুলের আলোতে তার তলার জল সব লালে-লাল—সন্ধ্যার ম্লানিমায় কিছু ঘোরাল। তার পাশে একটা তালগাছ, জলের ঢেউয়ের সাথে, ওঠা-নামা ক'রে খেলা কর্‌ছে। কতক-গুল' পাখী এসে ঝগড়া জুড়ে দিল বাসা নিয়ে।

হরেক রকম রঙের পাল টাঙ্গিয়ে কতকগুল' নৌক' আর বাঁকের মোড় ঘুরে, কেবল ঘুরে দাড়াল এ বাঁকে। যাঁরা পৌছে পারেনি, তাঁদের কেবল পালের বহরই দেখা যাচ্ছে। বড় নৌক'র মাঝিরা সব সে পালের তলায় বসে গল্প-গুজব কর্চ্ছে।

অল্প বাতাস, ঢেউগুল' সব ছোট ছোট। যেন বাতাসের সাথে আঁড়ি দিয়ে নাচ্‌ছে, সোহাগ কর্ত্তে এ-ওর ঘাড়ে ও-ওর ঘাড়ে, এলায়ে পড়্‌ছে—যেন সোহাগের

আঁড়ি,—কাড়াকাড়ি। নৌক' গুল' যাচ্ছে, নাচের তালে বাধা পড়ছে এদের, অভিমানে আছড়ে গিয়ে পড়ছে মাটিতে,—অভিমানি! আহত এরা ব্যথা পাচ্ছে, গর্জ্জে উঠ্ছে, বাধা দেওয়ার একটা ব্যর্থ প্রয়াসে, শুধু নিজেরাই বেশী ব্যথা পাচ্ছে,—কিন্তু দুর্জ্জয় তারা, উপেক্ষায় খল্ খল্ হাসি হেসে, গরবে আপন মনে চলে যাচ্ছে। আর ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় এরা জলের সাথে মিশে এক হ'য়ে যাচ্ছে।

ওকূল ঘেঁসে একটা বিয়ের নৌক' যাচ্ছে। শানাইয়ের ভৈরবী রাগিনীর সাথে তালে তালে ঢোলকে কাঠি পড়্ছে, যেন জলের কাঁদুনী সেই শানাইয়ের মাঝে মূর্ত্ত। সে নৌক'র পাশ দিয়ে একটা ছই খোলা নৌক'য় একদল ছেলে, হউস্ হউস্ কর্ত্তে কর্ত্তে বেয়ে চলে গেল।

আর একটু এগিয়ে, দু'ঝাড় বাঁশ। বাঁশের মাথা নোয়ায়ে কূলে ছোব ছোব হয়েছে—ঢেউয়ের জল তার আগায় ইঞ্চি কয়েক গিল্ছে, আবার ওগরাচ্ছে। যেন কমলে-কামিনী খেলা খেল্ছে। তার এপারে চাষীরা টোকা মাথায় দিয়ে হাল চালাচ্ছে, আর অস্বাভাবিক রকমারি কথায় জনবিরল মাঠের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গ্ছে। কেউবা ভাটেলিতে, "যার যমন কাজ, তার তমন সাজ" গাচ্ছে। কেউবা তাদের ভুইয়ে গরু গেছে বলে,—গরু, রাখাল ও তাদের মনিবের পিণ্ডি এক সাথে চট্কাচ্ছে।

স্রোতের উল্টাদিকে—বেগনে---যাবে যে মাঝি, তারা গুণে নেমেছে। চিৎ কাৎ হয়ে কোনমতে নৌক'র সে বিরাট বপুটাকে স্রোতের উল্টা দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর ছোট নৌক'র যারা তারা বেশ স্বচ্ছলভাবে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঐধারে ঝাউ গাছতলায় বেদেদের ডিঙ্গিখানা দোয়েল পাখীর মত নাচ্ছে।

চাঁদনী রাতের আরম্ভ। নদীর একূলের গাছপালা, ঘর বাড়ী সব দেখা যাচ্ছে। আর ওপার একটা স্বপ্ন-রহস্যে ঘেরা, বাস্তবিকতার জালে। ওপার চায় আপনার ছায়ালোক-রহস্যে সারা জগৎটাকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখ্তে, আর এপার চায়, বাদল-রাতের কাজল-পরা সজল আঁখি দুটী, সকরুণ দৃষ্টিতে নীলিমার পানে চেয়ে বিদেয় নেবার মৌন-শান্ত শুভ-মুহূর্ত্তে, ভুবনভরা রূপের আলো ঢেলে, ভোরের শুকতারাটীর মত ধীর প্রশান্তভাবে ধরণীর মাঝে আপনাকে হারায়ে ফেল্তে।

তার চাঁপাকলির মত মোহন আঙ্গুলের মৃদু আঘাতে, নিকষ কালো পুঞ্জমেঘের জমাট অন্ধকারের পর্দ্দা ঠেলে রূপালি-ঝরণার তুষারকণার মত, অজস্রধারে দিগন্তের কোলে আপনাকে বিলায়ে দিতে।

কিছুদিন ধরে সূর্য্যিদেবের মুখভার, চোখের জলও দু'চার ফোটা পাওয়া যাচ্ছে। বাতাস গজ্‌রাচ্ছে। যে ঢেউগুল' আগে নাচ্‌ত, এখন করে তারা মাতা-মাতি, পাগলামি। এখন তারা ধ্বংস করবার হিংসার উদ্দাম, উশৃঙ্খল, অসংযমিত আবেগে,—একটা প্রতিযোগিতায় ছুটে যাচ্ছে। দুটোয় ঘা লাগ্‌ছে, দুটো সোজা হয়ে উঠ্‌ছে, ভেঙ্গে কতকটা বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে। আবার নতুন-দুটো সৃষ্ট হচ্ছে। বাদল-বাউলের একতারার গানের সাথে একটানা জলের কল্‌কল্‌ শব্দ মিশে এক হ'য়ে যাচ্ছে।

একটানা টান, কোন বাঁধাই তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে না। অবাঁধা উদ্দাম বেগে ছুটে যাচ্ছে, পাড়ের সব জোয়াল ভেঙ্গে পড়্‌ছে, একটা আচম্‌কা দম্‌কা আঘাতে জলটা কিছুদূর চলে গেল—কিছুক্ষণ সে জা'গাটা বেশ উঁচুল থাক্‌ল, আবার যে গম্ভীর ভাব তাই। কোথাও মাঝে মাঝে আবর্ত্ত রচে, দুটো চার্‌টে ঘুরপাক খেয়ে, আবার আপনার স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটে যাচ্ছে।

এম্‌নিতর কতই খেলা না নদী খেল্‌ছে, কত দেশকে ধ্বংস করে কত নূতনের প্রতিষ্ঠা কর্‌ছে, ভবিষ্যতে যে আরও কত তার মনে আছে, তা বোধ হয় একজন ছাড়া কেউ জানে না।

সারনাথ

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়চৌধুরী—শিক্ষক।

গত সংখ্যায় সারনাথ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে কিছু বলিব আভাষ দিয়াছিলাম। অতি সংক্ষেপে ইহা বলা হইল।

বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসন হইতে B.N.W. Railway তে আমি কয়েক জন শিক্ষিত সঙ্গীসহ কাশীধাম হইতে সারনাথ দেখিতে যাই। সারনাথ কাশী হইতে ৪ মাইল দূর। এখানে বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাণমুক্তির উপায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। স্থানটী আমাদের ন্যায় ঘোর সংসারীর নিকট মনোরম না হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিয়া ভগবানের নাম গান করিতে ও তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিকট এই স্থানটী কেবল মনোরম নহে চিত্তাকর্ষকও বটে। সাধারণ লোকচক্ষে এখানে দেখিবার মত কিছুই নাই। আমাদের সঙ্গে সারনাথ দেখিতে আর কয়েকজন লোক গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক ছিলেন। সে দিন খুব গরম ছিল—বাতাস একেবারেই বন্ধ ছিল। প্রত্যেকেই ক্লান্ত হইয়াছিলাম। ফিরিবার সময় স্ত্রীলোক দুইটী সরল প্রাণে বলিলেন—যে আমাদের সারনাথ দেখিতে আগমন পণ্ডশ্রম। বাস্তবিক ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। যাঁহারা পুরাতত্ত্বানুসন্ধান জন্য শিল্পীর চক্ষু লইয়া এখানে আগমন করেন, এস্থান দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু সার্থক হইতে পারে। একটী যাদুঘর মঠের ধ্বংসাবশেষ, বড় একটী স্তূপ (ধামেক স্তূপ), একটী অবৈতনিক বৌদ্ধ পাঠশালা, একটী পান্থনিবাস ও বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের জন্য একটী বড় বাটী (নির্ম্মাণকার্য্য তখনও চলিতেছিল) আছে। যাদুঘরে বৌদ্ধ যুগের নানা প্রকার ভাস্কর্য্য, বৌদ্ধ মূর্ত্তি ও বৌদ্ধযুগের বহু পাথর ও মাটীর বাসন রক্ষিত হইয়াছে। অধিকাংশ মূর্ত্তি-গুলি ভারত আক্রমণকারী ভিন্ন ধর্ম্মী বৈদেশিকগণের ধ্বংস-লীলার পরিচয় দিতেছে। মূর্ত্তিগুলিকে সময়ানুক্রম অনুসারে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির পরিচয় ইত্যাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে।

বুদ্ধদেব বারাণসীতে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়া-ছিলেন। এখানেই তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে কয়েকটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সারনাথ স্তূপ তাহার অন্যতম। বর্ত্তমান বারাণসী নগরীর ৪ মাইল উত্তরে ঐ স্তূপ আছে। ঐ স্তূপ ধামেক নামে অভিহিত। যে স্থানে উক্ত স্তূপটী বিদ্যমান

তাহা অধুনা সারনাথ বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বে ঐ স্থান মৃগদাব (Deer Park) বা ঋষি-পত্তন নামে পরিচিত ছিল। সারনাথ স্তূপ তাহারই উপর নির্ম্মিত। কথিত আছে এই স্তূপ রাজর্ষি অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। স্তূপটী পুঞ্জীকৃত ধ্বংসরাশির মধ্যে বিরাজমান। তাহার তিন পার্শ্বে কৃত্রিম হ্রদ তাহাকে ঘেরিয়াছিল। ধর্ম্মোপদেশক নামের অপভ্রংশ "ধামেক"। এইস্থানেই বুদ্ধদেব আপনার "ধর্ম্মচক্র" পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই স্তূপটীর উপর উঠিবার কোন সিড়ি নাই। একটী লৌহ-শৃঙ্খল ধরিয়া ইহার উপর কষ্টে উঠা যায়। তবে দেখিবার মত কিছু নাই বলিয়া কেহ উহার উপর উঠিতে চেষ্টা করেন না। উহার সন্নিকটে একটী বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণ করা হইতেছে। সত্বর উহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইবে আশা করা যায়। তখন সারনাথ দেখিবার মত স্থান হইবে। যাহা হউক পুরা-কীর্ত্তি হিসাবে আমরা স্থানটী দেখিতে গিয়াছিলাম এবং ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। ৪ ঘণ্টা যাদুঘর ও মঠের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম।

———

Editorial.

Reconstitution of the school committee—

The following members were elected in a meeting of Donors, Benefactors and Guardians held on 13. 7. 30.

Mr.	H. Quinton—District Magistrate		Donor's Representatives
Babu	Pravashchandra Chatterjee,	Pleader	
,,	Amulyakumar Bose Roychowdhury	,,	
,,	Benodebehari Mukherjee	,,	
Rai	J. N. Ghosh Bahadur	,,	Guardian's Representatives
Babu	Upendranath Bose	,,	
,,	Upendragopal Biswas	,,	
Dr.	S. C. Das		

Babu Upendranath Chatterjee—Headmaster

„ Satyendranath Chatterjee—Teacher's Representative.

The committee elected the following office bearers on 27. 7. 30.

Mr. H. Quinton—President.

Babu Pravashchandra Chatterjee—Vice-President.

" Upendranath Bose—Secretary.

Headmaster—Asst. Secretary.

Teaching staff—

Babu Nirmalkumar Sen B. A., B. T has been granted nine months' leave and the temporary vacancy has been filled up by the promotion of Babu Satyendranath Chatterjee M. A. Asst. teacher. The proposed appointment of a new graduate teacher has been for the time being kept in abeyance, Babu Purnendu Nath Ghosh being permitted to continue in his present temporary post.

The Results of the Matriculation Examination—1930.

16 boys were sent up to the Matriculation Examination, 1930. The following 12 boys passed—

First Division.

1. Upendranath Das
2. Haripada Banerjee
3. Ratneswar Mitra

Second Division.

4. Makhanlal Sengupta
5. Kasiswar Roy
6. Matilal Prasad
7. Baidyanath Bose
8. Harendranath Bose
9. Sudhirchandra Ghosh
10. Brajarakhal Roy Chowdhury

Third Division.

11. Adhirchandra Ghosh
12. Anilkumar Ghosh.

Grant-in-aid and the enhancement of fees—

The fees of the boys of the 1st. four classes have been increased from April last with a view to get an increased grant-in-aid of Rs. 150. But the Inspector of schools after much correspondence with the school authorities has not increased the grant. The school authorities after increasing the pay of almost all the teachers set apart a monthly sum of Rs. 100 as building fund in the budget. The Inspector of schools has accepted the proposed increament of the pay of the teachers but has decreased the building grant by Rs. 50 and has sanctioned the former grant of Rs. 100 a month for two years more.

Inspector's visit—

Rai Khagendranath Mitra Bahadur, Inspector of schools, Presidency Division, paid a visit to our school on 7. 7. 30. He came to Khulna at the special invitation of the President of our school to discuss the question of Building grant and monthly grant-in-aid with the members of the school committee. He met the members in an informal meeting and frankly discussed with them the affairs of the school. In accordance with his sugges-tions a plan and estimate of a two-storeyed building for the school will shortly be prepared and submitted to the authorities.

আরাধনা

৬ষ্ঠ বর্ষ | JULY TO DECEMBER, 1930. | ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

ব্যাকুলতা

আমারি হৃদয়ে, তোমারি মূরতি
অঙ্কিত কর হে!
জীর্ণ-হৃদয়ে স্বরগ সুষমা
বিকশিত কর হে!
হৃদয়ালয়ের প্রতি কোণে কোণে
তোমার মূরতি জাগে সংগোপনে,
(আমি) দেখি দেখি করি তবুও তোমারে—
দেখি না গো প্রভু হে!
শ্রান্ত হৃদয়ে ভকতি-সলিল
বর্ষিত কর হে!

ভ্রান্ত পথিক পথ ভুলে যায়
দেখাইয়া তাহা দাও হে!
আঁধারের মাঝে ভকতি-প্রদীপ
জ্বালাইয়া প্রভু দাও হে!
জল-বুদ্বুদ মত ভকতির বাঁধ
দৃঢ় ভাবে প্রভু বাঁধ হে!
(যেন) ও পদ-রাজীবে জীবন-কুসুম
বিলাইয়া দিতে পারি হে!

শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়,
প্রথম শ্রেণী।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ ও নোবল পারিতোষিক

বালকগণ, তোমরা গত ১৭ই নভেম্বর সোমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার সম্পাদক বিশ্ববিশ্রুত সার চন্দ্র শেখর ভেঙ্কট রমণের সুইডেনের বিখ্যাত নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্তির জন্য ২টার সময় ছুটী পাইয়াছিলে। এই পারিতোষিকের মূল্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। পূর্ব্বে ১৯১৩ সালে বঙ্গদেশের মহাকবি শ্বেতশ্মশ্রু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের জন্য এই পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই গীতাঞ্জলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর মানবকে মুগ্ধ করিয়াছে। গত ৩০ বৎসর মধ্যে যে ১৫ জন বিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিত এই পারিতোষিক পাইয়াছেন তন্মধ্যে আমাদের উদীয়মান বৈজ্ঞানিক রমণ অন্যতম। কেবল ভারতবর্ষ নয় এসিয়া মহাদেশেও এ সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এই পারিতোষিক আনিবার জন্য রমণ সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্‌ম অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। ২০শে নভেম্বর বম্বে হইতে রওনা হইয়া ১০ই ডিসেম্বর সুইডেন পৌছিবেন এবং ঐ দিন এই পারিতোষিক গ্রহণ করিবেন ও পরদিন পদার্থ বিদ্যার আলোক বিষয়ে যে গবেষণার জন্য এই পারিতোষিক পাইলেন তাহা সর্ব্বসমক্ষে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন। পরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া আগামী এপ্রিল মাসে আবার কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবেন এইরূপ স্থির আছে। বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথকে তোমরা অনেকে দেখিয়াছ; আর না দেখিয়া থাকিলেও তাঁহার কবিতা ও গল্প পুস্তকের দ্বারা তোমরা তাঁহাকে নিজ জন বলিয়া জানিয়া লইয়াছ। তাঁহার বোলপুরের বিশ্ব ভারতী ও সুরুলের কৃষি নিকেতন তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বিশ্ব-জগতে বিখ্যাত করিয়া রাখিবে। কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য যে মহাপুরুষ আজ ভারত ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের নাম বিখ্যাত করিলেন তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী তোমাদিগকে আজ বলিব; মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিয়া মানুষ নিজেকে তাঁহাদের পথানুবর্ত্তী করিয়া থাকে।

আমার আশা আছে তোমরাও এই সকল শ্রেষ্ঠ মানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ কর। আমাদের অধ্যাপক প্রবরের জীবনী বলিবাব পূর্ব্বে যাঁহার নামের সঙ্গে এই পারিতোষিক সংযুক্ত তিনি কে তাহা তোমাদিগকে অতি সংক্ষেপে বলিব।

ইউরোপের উত্তরে সুইডেন নামে একটী দেশ আছে তাহা তোমরা জান। তাহার রাজধানী ষ্টক্‌হলম নগরে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৩ সালের অক্‌টোবর মাসে অক্লান্ত কর্ম্মী নোবেল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুরা নাম এলফ্রেড্ বার্ণহার্ড নোবেল। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের ন্যায় কেবল মাত্র শিক্ষার উন্নতিকল্পে দানবীর ছিলেন না। নিজে একজন রসায়নবিদ্ ডিনেমাইটের আবিষ্কারক, শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি মানবসেবার জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি ইটালির ম্যানরোমিও নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন, শিক্ষার শান্তিস্থাপন জন্য তাহার দান পৃথিবীতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি একজন শান্তির দূত ছিলেন। বর্ত্তমানে জাতি সংঘ (League of Nations) যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে তিনি বহু পূর্ব্বে তাহা করিবার চেষ্টা করিয়া অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা তোমাদিগকে রমণের ক্ষুদ্র জীবনী শুনাইব। ৪২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৮ সালে মাদ্রাজের ত্রিচিনা পল্লীসহরে রমণ জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে তিনি এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তিনি যে বিদ্যাবত্তায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন তাহা শৈশব হইতেই বুঝা গিয়াছিল। বি, এ, ও এম, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তোমরা জান যে এরূপ কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে সরকার বাহাদুর বাছিয়া লইয়া সরকারী কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে ভারতীয় রাজস্ববিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র জীবনেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যখন রাজস্ব বিভাগে চাকুরী করিতেন তখনও তাঁহার এই আকাঙ্খা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। কাজেই তাঁহার এই চাকুরী মনঃপূত হইল না। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলিকাতা

বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ণধার। তিনি মানুষ চিনিতেন। উদীয়মান বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টানিয়া আনিলেন। ব্যারিষ্টার দানবীর তারকনাথ পালিতের নাম তোমরা শুনিয়াছ। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্র নাথ পালিত এই খুলনায়ই এক সময় সেসন্ জজ ছিলেন। দানবীর তারকনাথেরই দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। সার আশুতোষ রমণকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। বৈজ্ঞানিক মৌলিক গবেষণার বিশেষ সুবিধা হইবে এই আশায় রমণও সাগ্রহে ঐ পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি কলিকাতার বিজ্ঞান সভার সংস্রবে আসিয়া অনেক মৌলিক গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। পরে বিজ্ঞান সভার সম্পাদক পরলোকগত অমৃত লাল সরকারের মৃত্যু হইলে রমণকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান সভার সম্পাদক মনোনীত করেন। এই সুযোগে চন্দ্রশেখর রমণও নিজ কার্য্যশক্তির পরিচয় দেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক মৌলিক গবেষণাও আবিষ্কার করিয়া তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া ভারতের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ১৯২৪ সালে তিনি রয়াল সোসাইটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। পৃথিবীর মধ্যে ইতিমধ্যেই তাঁহার সুনাম প্রচার হইয়া পড়ে। তিনি পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানাগারে বক্তৃতাদ্বারা স্বীয় প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৫ সালে তাঁহাকে রুষ-গভর্ণমেণ্ট নিজ খরচে রুষ-রাজধানী লেলিনগ্রাডে লইয়া যান। এই স্থানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৯০০ শত বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা বিষয়ে তাহাকে ঐ সভায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। ঐ বক্তৃতা দ্বারা তিনি কি ভাবে উপস্থিত বৈজ্ঞানিকগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। আমরা রমণের নিজ মুখে শুনিয়াছি যে তথায় ৪৫ মিনিট বক্তৃতার পর তিনি দেখিলেন যে, যে টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া তিনি বক্তৃতা দিতেছিলেন তাহার উপর ফুলের তোড়া প্রায় দুই ফিট গভীর হইয়াছে। উপস্থিত সকলেই পুষ্পতোড়ার দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। কয় জন ভারতবাসীর ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্যলাভ

ঘটে ? বিদ্যার আদর সর্ব্বত্র ইহা তোমরা চাণক্য শ্লোকে পড়িয়াছ ; ইহা তাহারই দেদীপ্যমান প্রমাণ। লেলিনগ্রাড হইতে ঐ সময় তিনি রুষিয়ার পুরাতন রাজধানী মস্‌কো যান। বোম্বাই হইতে লেলিনগ্রাডে যাইবার সময় তিনি নেপলস্‌, রোম ও মিউনিক হইয়া জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন নগরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে আকাশপথে একেবারে রুষ-রাজধানী লেলিনগ্রাডে যাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যোমজানে স্থান না থাকায় সোজাভাবে তাঁহার তথায় যাওয়া হয় নাই। অনন্যোপায় হইয়া তিনি বার্লিন হইতে ডেনজিগ ও তথা হইতে বল্‌টিক সাগরের উপর দিয়া আকাশপথে মোট প্রায় ৪০০শত মাইল অতিক্রম করিয়া কনিক্‌সবার্গে উপনীত হন। বার্লিন হইতে কনিক্‌সবার্গে পৌছিতে তাঁহার ৩ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। কনিক্‌স-বার্গে সহরে ট্রেণে উঠিয়া নবস্বাধীনতা প্রাপ্ত এস্‌থোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়া দেশের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে বলসেভিক্‌ রুসিয়ার রাজধানী লেলিনগ্রাডে পৌছিয়াছিলেন। মস্‌কো পৌছিয়া তিনি তথায় অনেক বিজ্ঞানাগার দেখিয়া আনন্দিত হন। ঐ বিজ্ঞানাগারগুলি পূর্ব্বে অত্যাচারী রুষ-রাজ সভাসদগণের আবাসস্থল ছিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আমলে উহা বিজ্ঞানমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। মস্‌কোর বিজ্ঞানাগারগুলি দেখিয়া তিনি ককেসস্‌ পর্ব্বতের পাদদেশে টিফলিস্‌ সহরে গিয়াছিলেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া পর্ব্বতের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিখ্যাত ভেনিস বন্দরের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি মস্‌কো হইতে ককেসস্‌ যাইবার সময় রুষ-পুলিসের কার্য্যশক্তির পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের টাকার থলিয়া ও বিদেশে যাইবার অনুমতি পত্র (Pass port) হারাইয়া গিয়াছিল। তিনি ইহাতে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়েন। রুষ-পুলিসকে সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহাদের সযত্ন চেষ্টায় ঐ টাকার থলিয়ার উদ্ধার সাধিত হয় এবং এই সংবাদ গাড়ীতে থাকিতেই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ কার্য্য রুষ-পুলিশের পক্ষে নূতন নহে।

বালকগণ, সদাশয় অক্লান্ত-কর্ম্মী রমণের ক্ষুদ্র জীবনী বলিতে গিয়া রুষ-দেশের অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়া ফেলিয়াছি। ইউরোপের স্বাধীন রাজ্য-

গুলি বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে কতরূপে কার্য্য করিতেছে এই উপলক্ষে তাহা তোমাদিগকে জানাইবার জন্য আমার প্রবন্ধ একটু বড় হইল। যাহা হউক চন্দ্রশেখর রমণ দেশে ফিরিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিলেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাক্তার রমণ আমাদের খুলনা জেলায় দৌলতপুর হিন্দু-একাডেমী পরিদর্শন জন্য কলেজ-ইন্‌স্পেক্টরগণের সঙ্গে দৌলতপুর আইসেন। তথায় তিনি তাহার সৌজন্য ও সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে তিনি সকালে ও বিকালে পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক দুইটী বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার নাম বিশ্ব-বিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২৮ সালে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে নাইট উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ঐ সালে তিনি ইটালির বিজ্ঞান-সভার বিশেষ পারিতোষিক ম্যাটুসি মেডাল প্রাপ্ত হন। ১৯২৯ সালে ফ্রাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক পি, এইচ, ডি উপাধি দান করেন ও ১৯৩০ সালে তিনি গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এল, এল, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। নোবেল পারিতোষিক পাইবার পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটীর হিউস মেডাল (মূল্য ১৫০০৲ টাকা) পাইয়াছেন। মহামতি নোবেল বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, সাহিত্য, শান্তি-স্থাপন বিষয়ক আবিষ্কার ও লেখার জন্য প্রতি বৎসর যে ৮০০০৲ হাজার পাউণ্ড (১২০ লক্ষ টাকা) মূল্যের ৫টী পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ পদার্থ-বিদ্যার জন্য পারিতোষিক পৃথিবীর বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবীর রমণকে দিয়া অর্থের সদ্‌ব্যবহারই করিয়াছেন। তোমরা দেশপূজ্য রমণ যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া যশস্বী হন তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে এবং তাঁহার ন্যায় জীবন যাপন করিয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবে। আশা করি ভগবানের কৃপায় তোমাদের আশা সুফল প্রসব করিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়চৌধুরী।

———

প্রভুভক্তি

সুবর্ণপুরে দেবনারায়ণ নামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বাস করিতেন। বন্য পশু শিকারে তিনি অতি অভ্যস্ত ছিলেন এবং উহাতে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। এই সব বন্য পশু শিকারে তাঁহার প্রধান ও বিশ্বাসী শরীররক্ষক দুষ্‌মন্‌ শিং তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিত। দুষমন্‌ শিং এর সাহায্যে তিনি অনেক জীবিত ব্যাঘ্র এবং আরও নানাবিধ জীবিত পশুপক্ষী ধরিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুষ্‌মন্‌ শিংহের নিবাস পশ্চিমে মজ-ফরপুর জিলায়। অতি শৈশবেই সে বাঙ্গালায় আসে এবং ভাগ্যচক্রে দেবনারায়ণের নজরে পতিত হয়। তিনি বালকের অসম সাহসিকতা বিলোকন করিয়া তাহাকে তাঁহার নিজের শরীর রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। দুষ্‌মন্‌ প্রায় ১৮। ১৯ বৎসর দেবনারায়ণের সঙ্গে বাস করিতেছিল এবং জমিদারের পরিবারের সহিত তাহার অতিশয় মেলামিশা ছিল। জমিদার পরিবারস্থ সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করিত এমন কি, অন্দর মহলে পর্য্যন্ত দুষ্‌মন্‌ শিং বিনানুমতিতে প্রবেশ করিতে পারিত। এক কথায় বলিতে গেলে দুষ্‌মন্‌ জমিদার পরিবারের নিকট আত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং পরিবার-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবনারায়ণ বাবু যখনই শিকারে বহির্গত হইতেন তখনই দুষ্‌মন্‌ শিংহকে তাঁহার সমভিব্যহারে লইতে হইত। একদা শীতের প্রারম্ভে জমিদার-বাবুর শিকারে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। যেমনি ইচ্ছা তেমনই কাজ। তখনই শিকারে যাইবার সরঞ্জাম সজ্জিত হইতে লাগিল। দুইখানি বৃহৎ বৃহৎ নৌকা সজ্জিত হইল। শুভ দিনে তিনি প্রায় ২০ জন লোক, বন্দুক, গুলি, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া নৌকায় পদার্পণ করিলেন। নৌকা ধীরে ধীরে সুন্দরবনাভিমুখে চলিতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে তাঁহারা সুন্দরবনের নিকট নদীতে নঙ্গর করিলেন। সে দিন আর শিকারে যাওয়া হইল না। চতুর্থ দিবসে বেলা দ্বিপ্রহরে সকলে তৃপ্তির সহিত ভোজন-পূর্ব্বক অস্ত্রাদি লইয়া ১৫ জন লোক সমভিব্যাহারে জমিদার বাবু তীরে পদার্পণ করিলেন। জমিদার বাবুর অগ্রে অগ্রে সাহসী দুষ্‌মন্‌ শিংহ সুদীর্ঘ বর্শা হস্তে

বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। জমিদার বাবু শিকারের সুবিধার জন্য দলকে সমান তিন ভাগ করিলেন, তিন দল পৃথক পৃথক স্থানে নিজেদের প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বেলা ৫টার পূর্ব্বে কিছুই উহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাত্র দুইটী হরিণশাবক স্কন্ধে লইয়া উহারা নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে তিন দিন গত হইল একটীও ব্যাঘ্র তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। চতুর্থ দিবসে মাত্র ১০ জন সশস্ত্র লোক সঙ্গে লইয়া জমিদার বাবু নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য দুষ্‌মন্ সিংহ জমিদার বাবুর পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতেছিল। তখন বেলা আড়াইটা। তাহারা নিঃশব্দে একটী ঝোপের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিসের যেন একটী কি শব্দ হইল। জমিদার বাবু অতিশয় উৎসুক হইয়া দুষ্‌মনের গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। দুষ্‌মন্ প্রভুর সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে তাহারা দেখিল যে দুইটী ব্যাঘ্র একটী ব্যাঘ্রী ও তৎসঙ্গে তিনটী ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রশাবক, তাহাদের অদূরে ক্রীড়া করিতেছে। জমিদার বাবুর ইঙ্গিতে সকলেই একসঙ্গে বন্দুক উত্তোলন করিল এবং দুড়ুম্ দুড়ুম্ শব্দে সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশ প্রকম্পিত হইল। ব্যাঘ্রগুলি চঞ্চল স্বভাব। সুতরাং লক্ষ্যভ্রষ্ট।

জমিদার বাবু শিকারে সুনিপুণ। তাঁহার গুলি একটী ব্যাঘ্র শাবকের বক্ষ ভেদ করিল। হতভাগা তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ব্যাঘ্রগুলি প্রথমে স্তম্ভিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের শত্রুদিগকে দেখিতে পাইয়া কম্পিত কলেবরে হালুম শব্দে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। দেবনারায়ণ বাবুর সঙ্গীগণ যে যার প্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। "হুজুর বৃক্ষে উঠিয়া পড়ুন" বলিতে বলিতে দুষ্‌মন্ নিকটস্থ একটী বৃক্ষে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। জমিদার বাবু আর উঠিতে পারিলেন না। ক্রোধোন্মত্ত ব্যাঘ্রসকল তাঁহার প্রতি আসিয়া পড়িল। প্রভুর প্রাণ যায় দেখিয়া দুষমন্ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া বর্ষা দ্বারা দুইটীকে বিদ্ধ করিল। তন্মধ্যে একটী তখনই ভূপতিত হইল। বাকী দুইটী জমিদার বাবুকে পরিত্যাগ করিয়া দুষ্‌মনের পরে আসিয়া পড়িল। জমিদার বাবু নিষ্কৃতি পাইলেন। দুষমন্ বার বার বলিতে লাগিল "হুজুর বৃক্ষে উঠুন।" জমিদার

বাবু তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে উঠিয়া পড়িলেন এবং ব্যাঘ্র দুইটার প্রতি অনবরত গুলি করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুইটা ব্যাঘ্রই নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দুষ্‌মনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুষ্‌মন্ তখন অজ্ঞান। ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের আক্রমণে তাহার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। এই নিবিড় বনপ্রদেশে তিনি কি করিয়া দুষ্‌মন্‌কে বাঁচান? এমন সময় সেই পলায়ন তৎপর বীর পুরুষেরা বীরত্ব প্রকাশ করিতে সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা বীরের ন্যায় মৃত ব্যাঘ্রের অঙ্গে বার বার প্রহার করিতে লাগিল। জমিদার বাবু তখন তাহাদিগকে কিছু বলিলেন না। তিনি তাহাদিগের সাহায্যে মৃত ব্যাঘ্র ও দুষ্‌মন্‌কে লইয়া নৌকায় তুলিলেন। সেখানে তাহার রীতিমত চিকিৎসা হইল। তিন দিবস পরে তিনি সকলকে লইয়া সুবর্ণপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশের যত যত চিকিৎসকগণ দুষ্‌মনের চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু হায়! দুষ্‌মন্‌কে কেহ বাঁচাইতে পারিলেন না। জমিদার বাবু সেই বীর পুরুষদের রীতিমত প্রকাশ্যস্থানে শাস্তি দিতে ভুলিলেন না। তাহারা ইতঃপূর্ব্বে গ্রামে প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, তাহাদের সাহায্য না পাইলে জমিদার বাবু নিজেও বাঁচিতেন কিনা সন্দেহ। পঞ্চম দিবসে প্রভুভক্ত দুষ্‌মন্ শিংহ ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দেবনারায়ণ বাবু তাহার যথারীতি সৎকার করিলেন ও তাহার স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার নিমিত্ত একটী সু-উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মন্দিরের একটা অংশে স্বর্ণাক্ষরে প্রভুভক্ত দুষ্‌মনের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত আছে।

শ্রীঅনিলভূষণ মুখোপাধ্যায়—৫ম শ্রেণী।

বহু উপদেশের ফল

পূজার সময় এক দরিদ্র তনয়,
পিতার নিকটে গিয়া মিষ্টভাষে কয়;
"কিনে দাও মোরে পিতঃ পোষাক পূজার,
পরশ্ব হইবে পূজা দেরি নাহি আর।"
বৃদ্ধ বলে "হইল বটে পূজার সময়
আছে এক অশ্ব আজি বিকাইব তায়।"
ইহা বলি দুই জনে আস্তাবলে গেল,
অশ্বটীকে ল'য়ে দোঁহে বাজারে চলিল।
গৃহ হ'তে বাজারের স্থিতি অতি দূরে,
দুই জনে যাইতেছে অতি ত্বরা ক'রে।
গলার রজ্জুটা ধ'রে বৃদ্ধ অগ্রে যায়,
হেনকালে এক যুবা আসিল তথায়।
পিতা পুত্রে দেখিয়া সে পদব্রজে যেতে,
কহে "হেঁটে যাও কেন অশ্বটী থাকিতে।"
ইহা শুনি বৃদ্ধ পিতা বলিল পুত্রেরে,
"লাফ দিয়ে উঠে বস ঘোড়ার উপরে।"
অশ্বের উপরে শিশু উঠিয়া বসিল;
এক স্থলে হেনকালে উপনীত হ'ল।
যথায় কতক বৃদ্ধ বসি এক স্থানে,
খেলিতেছে তাস, পাশা আনন্দিত মনে।
শিশুটিকে দেখি তারা তুরঙ্গ উপরে,
বলিতে লাগিল সবে রাগান্বিত স্বরে,
"নির্ব্বোধ বালক তুই না বুঝিস্ কিছু,
ঘোড়ায় চড়িয়া যাস্ পিতা হাটে পিছু।"
এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ পুত্রে নামাইল;
নিজেই অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল।
এইরূপে দুই জন পথ ধরি' যায়;
উপস্থিত এক বৃদ্ধা হইল তথায়।
ছেলেটাকে দেখিয়া সে পদব্রজে যেতে;
বলিতে লাগিল বড় দুঃখের সহিতে,
"বোধ হয় মাতৃহীন এই শিশু হয়,
নইলে কি পিতা সঙ্গে হেটে হেটে যায়?"
ইহা শুনি' বৃদ্ধ বড় দুঃখিত হইল,
দু'জনে ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল।
এইরূপে পিতা পুত্রে অশ্ব পৃষ্ঠে যায়,
সরল যুবক এক আসিল তথায়।
পিতা পুত্রে দেখিয়া সে অশ্বের উপর,
বলিতে লাগিল, "ওহে নিষ্ঠুর, পামর,
নাহি দয়ামায়া, তাই হইয়া নির্দ্দয়,
উঠ পৃষ্ঠে কত কষ্ট পাইতেছে হয়।
তাই বলি এবে কিছু বুঝে দেখ মনে,
দু'জনে ঘোড়াকে বহি লও এইক্ষণে।

ইহা শুনি ঘোড়া হ'তে দু'জনে নামিল;
দু'পা করিয়া অশ্বের চারি পা বান্ধিল।
তার মধ্যে একখানা বাঁশ দিয়া হায়;
চলিল লইয়া যথা মৃত ল'য়ে যায়।
অদূরে বালকদল খেলিতেছে মাঠে,
খেলা ভাঙ্গি' করতালি' পাছে পাছে ছুটে।
পশ্চাতে বালকদল কোলাহল করে।
হেনকালে উপনীত পুলের উপরে।
রাজার নিকটে আর কোলাহল স্বরে,
মুক্তি পাইবারে অশ্ব লাফালাফি করে।
বহু চেষ্টা পর তবে রজ্জু গেল ছিড়ি,
গভীর নদীর স্রোতে অশ্ব গেল পড়ি'।
ভ্যাবা চ্যাকা হ'য়ে তারা রহে দাঁড়াইয়া,
(কুকুরের দশা যথা মাংস হারাইয়া)
তাহা দেখি সর্ব্বলোকে করে হায় হায়।
দুঃখিত হইয়া তারা গৃহে ফিরি যায়।
ইহা দেখি মনে আমি চিন্তি অনুক্ষণ,
বহু উপদেশ শুধু ব্যর্থতা কারণ।
আর এক কথা মম বুঝিল হৃদয়,
এক কার্য্যে সকলের মন তুষ্ট নয়।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়—তৃতীয় শ্রেণী

সঙ্গদোষ

(১)

আজ শ্রীপুরের জমিদার-প্রাঙ্গণে বহুলোক সমবেত হইয়াছে। জমিদার রামরতন বসুর স্ত্রী আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। ডাক্তার বলেছে বাঁচবার আশা নাই। রামরতন বসুর তিন পুত্র। অমিয়, অনিল, অনন্ত। মধ্যম পুত্র অনিল অল্প বয়সেই মারা যায়। তাঁর জমিদারীতে বেশ আয় আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিয়কুমার এবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তকুমার গ্রামে মধ্য-ইংরাজি স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে।

(২)

দুপুর বেলা জমিদারপত্নী সাধ্বী সরলাবালা স্বামীর কোলে মস্তক রক্ষা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, "এদের একটু

দেখ।" এক মাস পরে মহাসমারোহে তাঁর পারত্রিক কল্যাণের জন্য শ্রাদ্ধ শান্তি করা হইল। কিছুদিন পরে অমিয় কলিকাতায় আই, এ, পড়িতে গেল। যাবার সময় তার ছোট ভাইকে অনেক আশা ও সান্ত্বনা দিয়ে গেল।

(৩)

অমিয়ের চরিত্রে কোন দিন পাপ স্পর্শ হয় নাই। তার চরিত্র ছিল দেবতার ন্যায় পবিত্র ও সরলতা মাখা। সে যেয়ে তার ভাই অনন্তকে ভাল ভাল গল্পের বই পাঠাত। কলিকাতার বৈচিত্র বর্ণনা করে তাকে চিঠি লিখ্‌ত। তাকে উৎসাহ দিত সে লেখাপড়া শিখ্‌তে পার্‌লে এখানে এসে তারা দু'ভাই মিলে সুখে থাক্‌বে। রামতরন বাবু অমিয়কে মাসে ৫০৲টী টাকা পাঠাইতেন। অমিয়ের স্নেহ যত্নে মাতৃহীন অনন্ত কোন দিন মায়ের অভাব বুঝ্‌তে পারে নাই।

(৪)

সহস্র পাপীর নিকট যদি একজন পুণ্যবান যায়, তখন সে তার স্বভাববশতঃ তাদের পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার কর্‌তে চেষ্টা করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে অবশেষে তাকে বিফলমনোরথ হ'তে হয়। চারিদিক থেকে পাপ মনোলোভা মূর্ত্তি ধ'রে তাকে পাপের পথে নিতে চায়। পুণ্যের পথে যাওয়ায় চেয়ে পাপের পথে যাওয়া সহজ। তারপরে সে একটু একটু করে পাপপঙ্কে ডুব্‌তে থাকে। তারপরে সে আর তা থেকে উদ্ধার পায় না। একেবারে অতলতলে ডুবে যায়। অমিয় যখন কলিকাতায় আসিল তখন সে খুব ভাল ছিল। কখনও বৃথা আমোদ-প্রমোদ তাকে আকৃষ্ট কর্‌তে পার্‌ত না। তার কতকগুলি কু-সঙ্গী জুটেছিল, তারা তাকে ক্রমাগত প্রলোভন দেখাত। প্রথম প্রথম সে আত্মরক্ষা কর্‌তে পারিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তাকে পাপপঙ্কে ডুব্‌তে হল। তখন সে থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। পড়াশুনা এক প্রকার ছেড়ে দিল। ক্রমে সে মদ ও চুরুট ধরিল। তখন সে অনন্তকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল। সে চুরি করা শিখিল।

(৫)

রামরতন বাবু যখন এই সব কথা জান্‌তে পারলেন, তখন তার মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। তাকে ত্যাজ্যপুত্র কর্‌লেন। ইহার কিছুদিন পরে রামরতন বাবুর

মৃত্যু হ'ল। তিনি তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি অনন্তকে উইল করে দিলেন। অনন্ত কিছুদিন ধরে অমিয়ের অনুসন্ধান করল কিন্তু তাকে পেল না।

(৬)

কিছুদিন পরে অনন্ত তার দাদা অমিয়ের খোঁজ পাইল। সে তখন খেতে না পেয়ে একজনের পকেট হ'তে টাকা চুরি করতে গিয়েছিল কিন্তু ধরা পড়িয়াছে। তার বন্ধুগণ বিপদের সময় কোথায় গেল তা কেহ জানিতে পারিল না। অনন্ত ৩০০৲ টাকা জামিন দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনল। তার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ী এসে সে অনেকটা ভাল হল। সঙ্গদোষে তার নৈতিক, আর্থিক, মানসিক সকল রকম অধঃপতন ঘটিয়াছিল। সঙ্গগুণে মানুষ দেবতা হ'তে পারে। উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার সঙ্গদোষে মানব পশুর অধম হইয়া পাপের অতল তলে ডুবে যাইতে পারে। ইহাই সৎসঙ্গের গুণ ও অসৎ সঙ্গের দোষ।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ—৩য় শ্রেণী।

মুছাফিরের ডায়েরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

অযোধ্যায় সরযুতে স্নান ক'রে আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। পণ্ডিতজীর কৃপায় প্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম। পাণ্ডার একজন চর আমাদের সঙ্গে ছিল। প্রথমে সরযুর ঘাট কয়টা দেখলাম — রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট ইত্যাদি। তারপর মন্দিরগুলি দেখতে গেলাম। অযোধ্যায় অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। প্রায় মন্দিরগুলি যেমন বড় তেমনি সুগঠিত; এমন বাড়ী প্রায় নাই যেখানে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নাই। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে সীতারামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত

আছে। মন্দিরের সংখ্যা এত বেশী যে এক মাস থেকে দেখলেও দেখে শেষ করা যায় না। যথাসম্ভব প্রধান প্রধান মন্দির দেখে আমরা মণিরাম্ ছাউনি দেখ্‌তে গেলাম। এখানে আড়াই শত তিন শত সন্ন্যাসী থেকে রাম নাম করেন। সেখানে তাঁদের প্রসাদ পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। সে এক বিরাট ব্যাপার; অতি বৃহৎ পাকা ঘর আছে তথায় তিন শতের অধিক লোক একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেতে পারে এবং তার ঠিক সম্মুখে রাস্তার ওধারে খুব লম্বা পাকা ঘর আছে তথায় শত শত সন্ন্যাসী বসে রাম নাম কচ্ছেন এবং বেলা ১০ টার পর ঘণ্টা বাজলে প্রসাদ পেয়ে আসেন। কি সুন্দর ব্যবস্থা! নিরুদ্বেগে কত লোক এক স্থানে বসে ধর্ম্ম আলোচনা কচ্ছেন, তাঁদের খাবার, থাক্‌বার কোন চিন্তা করতে হয় না। এক স্থানে অত সন্ন্যাসী আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। হরিদ্বার থেকে লছমন ঝোলার পথে স্বর্গাশ্রম নামক স্থানেও অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি কিন্তু সে ও ভাবে নহে, সে পরে বলব। যা বল্‌ছিলাম মণিরাম ছাউনিতে গেলে কয়েক জন সন্ন্যাসী আমাদের বিশেষ যত্ন করে বসালেন; তাঁদের আগ্রহ দেখে বড়ই প্রীত হলাম। সে স্থানে রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা হচ্ছিল একজন ঐ দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাঠ করবেন। আমাদেরও শুনবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হল তাই সন্ন্যাসীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বসে পড়লাম। প্রথমে রামনাম কীর্ত্তন হল। ২। ৪ জন করে বহু সন্ন্যাসী এসে কীর্ত্তনের স্থানে সমবেত হতে লাগলেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। বাঙ্গালীর মধ্যে আমরা তিন জন এবং আর ২।৩ জন স্ত্রীলোক ছিলেন। বেশ আনন্দ পাওয়া গেল; কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর পণ্ডিতজী এসে পাঠ সুরু করলেন। দেখলাম পণ্ডিতকে সবাই বিশেষ সমাদর করলেন দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁর পাঠ আমার বিশেষ বোধগম্য হল না, আমাদের পণ্ডিতজী হয় ত কতকটা হজম করতে পারলেন। তিনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন কিম্বা বসে বসে ঝিমুচ্ছিলেন তাহা সম্যকরূপে বোঝা গেল না তথায় অধিক্ষণ থাকা আমাদের ঘটে উঠ্‌ল না তাঁকে সজাগ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য্যদেব ডুবু ডুবু; কিছু দূর হেটে গিয়ে হনুমান গোরী স্বর্ণ সিংহাসন কয়েকটী রাজাদের প্রতিষ্ঠিত জাক-জমক্‌শালী দেবালয় দেখে রাজা দশরথের গদী দেখতে গেলাম। হনুমান গোরীতে

যেতে সিড়ি বেয়ে অনেক দূর উঠ্‌তে হয়, অনেক ভীড়ের ভিতর দিয়ে যেতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল। দশরথের গদীতে গেলে পাণ্ডারা বলিল "এই রাজা দশরথের বসবার স্থান ছিল। এখানে বসে তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করতেন"। অতি প্রকাণ্ড একটী দালানের মধ্যে প্রকাণ্ড একটী হল আছে তার মধ্যখানে একটী আসন ও পশ্চিম পার্শ্বে এক খানি কৌচ্‌ আছে। সেখানে গেলে বড় এক খানা খাতা বের করে পাণ্ডা বলিল "এখানে ৫৲ টাকা, ১০৲ টাকা, ২০৲ টাকা ইত্যাদি যার যেরূপ ক্ষমতা তাই দিয়ে প্রণাম করতে হয়। ঐ খাতায় অনেক লোকের নাম ও তাদের দানের পরিমাণ দেখ্‌লাম, আমরা সামান্য কিছু দিয়ে পাণ্ডার বিরক্তিভাজন হয়ে সরে পড়্‌লাম। সেই যে রাজা দশরথের গদী সে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়ে পড়্‌ল। তার চেয়ে বহু পুরাতন বাড়ী অযোধ্যায় দেখেছি। যা হ'ক ও বিষয়ে অধিক আলোচনা করে ধর্ম্মপ্রাণ লোকদের অপ্রিয় হ'তে চাই না। তারপর রামলীলা দেখতে আনন্দভবনে গেলাম। আজ বিজয়া দশমীর দিন তাতে আবার শ্রীরামচন্দ্রের দেশ। চারিদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে। ২০।২৫ হাত লম্বা একটী রাবণের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি করে দুইটী সুন্দর ছোট ছোট ছেলেকে রাম আর লক্ষ্মণ সাজিয়ে দেওয়া হয়। রাম আর লক্ষ্মণ ঐ বিরাট মূর্ত্তি রাবণের সহিত যুদ্ধ করেন। পুনঃ পুনঃ রাবণের মুণ্ড কেটে ফেলা হয় আর ঐ মুণ্ড পুনরায় যথাস্থানে গিয়ে লাগে, এই প্রকারে যুদ্ধ চল্‌তে থাকে পর পর রাবণ নিহত হয়। এই হচ্ছে রামলীলার প্রধান অঙ্গ। হাজার হাজার লোক ঐ দেখ্‌তে ওখানে জমা হয়। আমরা সব্‌টা দেখবার জন্য অপেক্ষা না করে ভীড় থেকে সরে পড়লাম। ওখান থেকে আমরা অযোধ্যার রাজবাড়ী দেখতে গেলাম। রাজার বাড়ীটা অতি প্রকাণ্ড, খুব বড় কম্পাউণ্ড। প্রধান গেটের কাছে গিয়ে দেখি দুই জন Captain এর অধীনে কয়েকজন সৈন্য উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে। অতগুলি বন্দুক এবং চক্‌চকে কোষমুক্ত তরবারি দেখে প্রাণটা দমে গেল এবং বাক্‌যুদ্ধে তৎপর অত্যন্ত পরিণামদর্শী বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতার সহিত দাঁড়াইয়া তাহাদের Military drill দেখিতে লাগিলাম।

অবশ্য আজকালকার কথা বলছি না, এ দু' তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। যখন দেখলাম স্থানীয় লোকেরা অনায়াসে অক্ষত দেহে ঢুকে পড়ল তখন আমাদের লুপ্ত বীরত্ব পুনরায়ত্ত করে তাদের পিছু পিছু ঢু'কে প'ড়লাম। প্রবেশ করে দেখ্‌লাম প্রথমে সৈন্যদের থাক্‌বার স্থান। তার পরের মহল্লায় কর্ম্মচারীদের অফিস ঘর। তার পরের গেট দিয়ে ভিতরের অর্থাৎ ৩য় মহল্লায় ঢোকার পথ, ঐ গেটের উপরে দোতালায় রাজার সাধারণ বৈঠকখানা। গেটের দুই পাশ দিয়ে উপরে উঠার এবং নামার সিড়ি। সিড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠে পড়েছি; উদ্দেশ্য রাজার বৈঠকখানা দেখব। রাজা উপরে আছেন জান্‌তাম না আমার ধারণা ছিল আমার সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছেন কিন্তু তাঁরা আস্‌তে পারেন নি তা আমি দেখি নাই। উপরে উঠ্‌তেই পোর্টার জিজ্ঞাসা করিল কি চাই? আমি বলিলাম শুধু দেখতে এসেছি। আমাকে আর কিছু না জিজ্ঞাসা করে সে লোকটী ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল, কেন কিছু বুঝলাম না। মিনিট দুই পরে এসে বল্‌লে 'আইয়ে বাবু' তার সঙ্গে দুর্গা বলে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দেখি বেশ সুসজ্জিত বড় একটা ঘর, আসবাবগুলি বেশ পরিপাটীরূপে একটু ফাক ফাক করে সাজান কয়েকখানা মূল্যবান কৌচ আছে, তার একখানার উপর সুসজ্জিত দুইটী যুবক বসে আছেন আর তাঁদের সম্মুখে আর একখানা কৌচের উপর তাঁদের চেয়ে একটু বয়স্ক এবং অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় আর একটী ফিট ফাট ভদ্রলোক বসে আছেন। আমি ঢুকে তাঁদের অভিবাদন করলে অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় ব্যক্তি আমাকে যত্ন করে বসালেন। তিনি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্‌লাম "ইংরাজীতে বলিলে আমার পক্ষে কথোপকথন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।" তারপর সেই ভদ্রলোকটীর সহিত নানা বিষয়ে অনেক আলোচনা হ'ল। অপর কৌচখানায় যে দুইটী যুবক বসেছিলেন তাঁরা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি রাজার Private Secretary এবং অপর দুই জনের মধ্যে এক জন রাজা আর এক জন তাঁর বন্ধু। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন আমি কোন জমিদার কি না। তার ধারণা হয়েছিল আমি একটা হোমরা চোমরা না হ'লে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাব কেন? কিন্তু আমি যে মোটেই দেখা করতে যাই নাই, ওটা হঠাৎ আমার

অজ্ঞাতসারে হ'য়ে পড়েছে তা' ত তিনি জানতে পারেন নি। যা হোক তার প্রশ্নের উত্তরে আমি বল্লাম "I am neither a King nor a Zeminder but a petty school-master." আমার কথা শুনে তিন জনেই হেসে পড়লেন। আমি প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হলাম কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ হ'ল আমি petty কথা বলায় তাঁরা হেসেছেন। আমার কথা শুনে ভদ্রলোকটী আমার আরও কাছে ঘেসে বসলেন এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বল্লেন Petty school-master বললেন কেন? School master petty নহে এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ভাবপ্রবণতার সহিত অনেক বলতে লাগলেন এবং আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমাদর করলেন। লোকটী বেশ ভাল বক্তা, বহুদর্শী এবং শিক্ষিত, অমায়িকও বটে। শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। কি উদ্দেশ্যে গিয়েছি, কোথায় আছি, কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না সব জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও কোন আশঙ্কা না করে বিশেষ খোলাখুলিভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। রাজা এবং তাঁর বন্ধু শান্ত স্কুলের বালকের মত বসে বসে শুনলেন ছাড়া আমাদের কথোপকথনে যোগ দিলেন না। রাজা এবং তাঁর বন্ধু উভয়ই যুবক। আমার আর অধিকক্ষণ থাকা হ'ল না কারণ মনে করলাম আমার বন্ধুদ্বয় নিশ্চয়ই আমার বিলম্বে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন এবং পণ্ডিতজীর মিষ্ট সম্ভাষণ আমার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছে। তাঁদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাহিরে এসে দেখি উভয়েই আমার উপর বিশেষ খাপ্পা হ'য়ে আছেন। পণ্ডিতজী তাঁর সমস্ত ব্রহ্মতেজ কেন্দ্রীভূত করে মুখ দিয়ে ছাড়তে লাগলেন। তবে আমাকে ভস্ম না করে এ যাত্রা রেখে দিলেন। তৃতীয় মহলে প্রবেশ করে দেখি খুব প্রকাণ্ড একটা পার্ক, তার ডান দিকে পূজার মহল, আর এক প্রান্তে সুন্দর শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরে অপূর্ব্ব সীতারাম বিগ্রহ। এ সব দেখতে দেখতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। পাণ্ডার চর বহু পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। আমরা সে দিনকার মত আর না ঘুরে ধর্ম্মশালার দিকে ফিরলাম। ধর্ম্মশালায় এসে কিছু পুরি মিষ্টান্ন উদরস্থ করে রাত্রের মত বিশ্রাম করা গেল।

পরদিন প্রাতে আমরা সরযূ তীরে লক্ষ্মণ ঘাটে গিয়েছি তথায় একজন সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হ'ল। তিনি অতি প্রাচীন এবং ভাল লোক বলে মনে হল। তিনি

কথা প্রসঙ্গে বল্লেন "এখানে লোক এসে যেমন সব মন্দিরে মন্দিরে যায় সেরূপ সরযুর তীরে চরে এক মৌনী বাবা আছেন তাঁকেও দর্শন করিতে যায়," তাঁর কাছ থেকে পথের সন্ধান নিয়ে সরযুর তীর দিয়ে বরাবর দক্ষিণ দিকে চল্‌তে লাগ্‌লাম। এ স্থানটী আমাদের বিশেষ আনন্দপ্রদ হ'য়েছিল। সরযুতে স্থানে স্থানে বহু যাত্রী স্নান করছে দেখতে দেখতে আমরা চল্‌তে লাগলাম। ক্রমে নির্জ্জন বিস্তীর্ণ চরে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। চর লম্বাকেশে বনে ঢাকা, মাইল দুই যাওয়ার পর দেখলাম দূরে একটী পতাকা বায়ুভরে উড়্‌ছে। সেটী লক্ষ্য করে চলতে লাগ্‌লাম। কাছে গিয়ে দেখি কয়েকজন সন্ন্যাসী এক্‌ খানা খোলা ঘরে বসে রাম নাম কচ্ছেন। তার ওপাশে কয়েক খানা ছোট ছোট কুটীর। একটী অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসীকে দেখে মৌনীবাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ইসারা করে এক খানা ক্ষুদ্র গোলাকার পর্ণকুটীর দেখিয়ে দিলেন। আমরা অতি সন্তর্পণে কুটীরের ভিতর ঢুকলাম। ঢুকে দেখি এক খানা খাটের উপর মশারীর মধ্যে অসাধারণ তেজোময় একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি উপবিষ্ট। আমরা নিঃশব্দে ঢুকতেই তিনি মশারীটা বেশ করে গুজে দিলেন, আমরা প্রণাম করে তার পাদুকা স্পর্শ করিলাম। অত্যন্ত বার্দ্ধক্য হেতু চামড়া-গুলি শিথিল হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু চক্ষু দুটী অসাধারণ তেজপূর্ণ। তাঁর মস্তকে একটী গেরুয়া পাগড়ী, গায়ে একটী ঢিলে গেরুয়া রংএর জামা, পরণে এক খানা গেরুয়া বস্ত্র। শরীরের রং অত্যন্ত ফরসা। তাঁহার দিব্য তেজোময় মূর্ত্তিটী এখনও চোখের সামনে ভাস্‌ছে। এর পর অনেক জায়গায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখেছি ঐ অযোধ্যায় বহু সন্ন্যাসী দেখেছি হরিদ্বারে, স্বর্গাশ্রমে কত সন্ন্যাসী দেখেছি। পর্ব্বত-গুহায়ও কয়েকজন সন্ন্যাসী দেখেছি কিন্তু এরূপ মুক্ত আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন মাত্র। বসে বসে আলো-চনা করছিলেন, আমরা তথায় প্রায় আধ ঘণ্টা বসেছিলাম। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ঐ ঘরে সেই ছোট সন্ন্যাসীটী প্রবেশ করেন; তাঁকে আমাদের কিছু প্রসাদ দিতে বল্‌লেন (ইসারায় নহে কথায়)। অতি ছোট ছোট এক জাতীয় খইএর মুড়কী এবং অতি সুস্বাদু সুগন্ধি ক্ষীর জাতীয় একটী দ্রব্য প্রসাদ রূপেপ্রাপ্ত হ'লাম।

আর কিছুক্ষণ বসে থেকে বাহিরে এসে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে মৌনী বাবার বয়সের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলিলেন "উহার বয়স কত কেহ বলিতে পারে না, কেহ ১৫০ শত, কেহ ২০০ শত এইরূপ বলে আমি ঠিক বলিতে পারি না। এই স্থানটী নির্জ্জন বলে তিনি সাধনার উপযুক্ত বলে বেছে নিয়েছিলেন। অনেক দিন তিনি এখানে একাকী থেকে সাধন ভজন করেন, তারপর ক্রমে ২।১ জন করে এখন ১৫।২০ জন সন্ন্যাসী এখানে দিবারাত্র থেকে রাম নাম করেন," এ স্থানটী সাধনার বিশেষ উপযুক্ত, চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত কোন লোকালয় নাই। আমরা আবার সরযুর তীর দিয়ে বরাবর বাসায় এসে পৌছিলাম। ঐ দিনই আমরা অযোধ্যা ত্যাগ করে হরিদ্বার যাত্রা করব, একটু ব্যস্ত হয়ে আমরা বাসায় পৌছিলাম। একটু বিশ্রাম করে সরযুতে স্নান করিতে যাবার সময় পণ্ডিতজী পাণ্ডাকে বল্লেন "ঠাকুর আজ আমরা চলে যাব," পাণ্ডার তখন স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ল, সে পণ্ডিতজীকে বলিল "জন প্রতি ৫৸৵১০ টাকা দিতে হ'বে এখানে এই নিয়ম," পণ্ডিতজী তার সঙ্গে একটু তর্ক বিতর্ক করে স্নান করে এসে আমাদের কাছে সব বল্লেন। শুনে আমাদের চক্ষু স্থির, কিন্তু এযে পয়সা কড়ির ব্যাপার, কাজেই চক্ষুস্থির হলেও মুখজোর বাড়াতে হল। আমরা দু'জন স্নান করতে যাবার সময় পাণ্ডার কাছে এরূপ কথা শুনে বললাম "এটা ধর্ম্মশালা না তোমার বাড়ী" পাণ্ডা উত্তর করিল "এটা ধর্ম্মশালা" তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন তীর্থস্থানে বা কোথাও কোন ধর্ম্মশালায় যাত্রীর নিকট থেকে জুলুম করে পয়সা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে?" পাণ্ডা বল্লে "না"। তাকে আর কিছু না বলে আমরা স্নান করতে চলে গেলাম; ফিরে আসবার সময় দেখি পাণ্ডার ঘরের কাছে ৮।১০ জন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রেগুলেসন লাঠি হস্তে পাগড়ী ধারী পাণ্ডার চর জড় হয়েছে। পাণ্ডার ঘরের কাছ দিয়ে আমাদের উপরের ঘরে যেতে হয়। যাবার সময় পাণ্ডা আমাদের ডেকে হিন্দি এবং বাংলা খিচুড়ী পাকান এক অপূর্ব্ব ভাষায় বল্লে "বাবু সবাইকে জিজ্ঞাসা করে জান আমাদের এখানে জন প্রতি ঐরূপ দেওয়ার নিয়ম। এই দেখ না এরা কি দিচ্ছে (কয়েক জন যাত্রীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল) পুলিসকে জিজ্ঞাসা কর, অন্য সবাইকে জিজ্ঞাসা

কর আমরা ঐরূপ পেয়ে থাকি।” আমরা দেখ্‌লাম নরম হ’লে আর রক্ষা নাই, আমরা দৃঢ়ভাবে বল্‌লাম “পুলিস টুলিস জানি না আমরা ধর্ম্মশালায় এ নূতন আসি নাই বহুস্থানে ঘুরে বহু ধর্ম্মশালায় থেকে এসেছি, তার অনুপাতে এ একটা আস্তাবল মাত্র। কিন্তু কোথাও এরূপ ব্যবহার পাই নাই। কোথাও একটা পয়সাও দাবী করে নাই। ৫।৶১০ দূরের কথা আমরা জন প্রতি ।৶১০ আনাও দিতে রাজী নহি। আমাদের উপর যদি কোনরূপ জুলুম কর এখান থেকে তার করে তোমাদের ব্যবহার সেই বম্বেওয়ালা অর্থাৎ এই ধর্ম্মশালার মালিককে জানাব আর সমস্ত খবরের কাগজে লিখে তোমাদের গুণ্ডামীর কথা সবাইকে জানাব এবং ইংরাজ সরকারকেও জানাব।” পাণ্ডা একটু নরম হ’য়ে বলল “আমরা পণ্ডিতজীকে বলেছি আমাদের ঐরূপ নিয়ম। আচ্ছা তোমরা বাবু না হয় ২॥৶১০ টাকা করে জনপ্রতি দিও।” আমরা দেখলাম ঔষধ ধরেছে, তখন আরও শক্ত হ’য়ে বল্‌লাম আমরা ॥৶১০ আনা করেও দেব না। আমাদের কোন প্রকারে যদি আজ যেতে বাধা প্রদান কর তা’হলে আমাদের ১০০৲ টাকার টিকিট নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ তোমাদের ঐ ১০০৲ টাকা দিতে হবে।” তাদের কোন জবারের প্রতীক্ষা না করে আমরা উপরে চলে গেলাম। আমাদের ঘরের কাছে বিকানীরের একদল যাত্রী ছিল তারা আমাদের নিকট সব শুনে আমাদের এক পয়সাও দিতে নিষেধ করিল। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটা গাড়ী ডাক্‌তে গেলাম। ডিটেক্‌টিভের ন্যায় পাণ্ডার একটী চর আমাদের পিছু পিছু গেল। গাড়ী এনে আমাদের জিনিষ পত্র চাপাতে লাগ্‌লাম। পাণ্ডা বলিল তাহ’লে বাবু আমাদের কিছু দেবে না ? আমাদের ধারণা হ’য়েছিল যাবার বেলায় আমাদের বাধা দেবে, জিনিষপত্র হয় ত আট্‌কাবে, কিন্তু তা কিছু করিল না। ১০।১২ জন গুণ্ডার মত তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। পণ্ডিতজী বললেন “আমরা যা দেই যদি খুসী হয়ে নাও তা হলে কিছু দিতে পারি নচেৎ কিছু দেব না।” পণ্ডিতজী এই কথা বলে ২৲ দুইটী টাকা দিয়ে পাণ্ডাকে প্রণাম করলেন। পাণ্ডা টাকা দুটী ছুড়ে ফেলে দিল। পণ্ডিতজীও শক্ত আদমী, তিনি টাকা দুটী তুলে নিয়ে ট্যাকে

করে বললেন "বহুৎ আচ্ছা চল আমরা চলে যাই।" আমরা গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। গাড়ী চলতে লাগল, একটু দূর গেলে দেখি পাণ্ডার একটী চর ছুটে আসছে। গাড়ী থামাতে বললাম, লোকটী কাছে এসে বলিল "দেও বাবু টাকা দেও," পণ্ডিতজী আমাকে আদেশ করলেন "যাও তুমি গিয়ে দিয়ে এস," আমি টাকা দুটী দিয়ে পাণ্ডাকে প্রণাম করিলে পাণ্ডা ভ্রূকুটীর সহিত গ্রহণ করিয়া কি বগর বগর করিতে লাগিল। আমি ফিরে এসে গাড়ীতে উঠলাম। ক্রমে আমরা ষ্টেশনে এসে পৌঁছিলাম। এই বম্বেওয়ালার ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে এত লেখার কারণ এই যে ভবিষ্যতে যারা অযোধ্যায় যাবেন তারা যেন ঐ গুণ্ডার দ্বারা পরিচালিত ধর্ম্মশালায় না যান। ষ্টেসনের কাছে খুব প্রকাণ্ড একটী অতি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে সেখানে যত লোক যান না কেন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। তা ছাড়া আরও বেশ ভাল ভাল ধর্ম্মশালা রয়েছে। আমরা ষ্টেশনে এসে ঐ ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনেছি। ৺কাশীধামে এসে হরিপ্রসন্ন রায়চৌধুরী নামে একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছেও ঐ ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। তাঁদের সব জিনিষপত্র চুরি করে নিয়েছিল এবং ঐ ৫।৵১০ করে মাথা প্রতি আদায় করেছিল। এখানে এসেও আর একজনের কাছে ঐরূপ জুলুম করে টাকা আদায় করার কথা শুনেছি। আমাদের সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক ছিলেন না তাই আমরা কোন প্রকারে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম। অযোধ্যা অতি প্রাচীন সহর, বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নবাড়ী পড়ে আছে। অযোধ্যা সম্বন্ধে কল্পনায় যে ছবি এঁকেছিলাম সেখানে গিয়ে তার বিশেষ কিছু পেলাম না। বিশেষ করে বানর, কচ্ছপ আর পাণ্ডার স্মৃতি নিয়ে ২৪শে অক্টোবর বেলা দুই ঘটিকার সময় Deradun Express এ আমরা অযোধ্যা ছেড়ে হরিদ্বার রওনা হ'লাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়চন্দ্র ঘোষ।

অন্তর্য্যামী

আজি জাগ্রত নহি, সুপ্ত,
অলস ঘুমের যবনিকা খানি
কে দিবে করিয়া মুক্ত ?
আজি জাগ্রত নহি, সুপ্ত।

আজি প্রকাশিত নহি, গুপ্ত,
গোপন হৃদয়ে সুযশের বীজ,
কে দিবে করিয়া উপ্ত ?
আজি প্রকাশিত নহি, গুপ্ত।

আজি অধরমে আছি লিপ্ত,
বহিছে পাপের প্রবল প্রবাহ,
ধর্ম্ম করিয়া লুপ্ত,
আজি অধরমে আছি লিপ্ত।

আজি জগৎ হয়েছে ক্ষিপ্ত,
মহা পাপানলে ধরণীর বুক
হয়েছে দারুণ তপ্ত ;
আজি জগৎ হয়েছে ক্ষিপ্ত।

আজি ছিন্ন হয়েছে তাঁর
আজি বিকল হয়েছে যন্ত্র
বাজে না তো আর বীণ
মরণের দ্বারে দাঁড়ায়ে আবার কে ডাকিছে অতি ক্ষীণ ?
আজি ভুলে গেছি সব সুর—
সুরের লাগিয়া যাবো কি সেখানে ?
সে যে আজি বহুদূর।

মনে নাই আজি গীতি
কত শতবার আয়াস করিনু
তীক্ষ্ণ করিতে স্মৃতি
না পারিয়া শেষে মনের দুঃখে কাঁদি শুধু দিবারাতি।

চারি দিকে আজি বিপুল ভীতির নৃত্য
চারিদিকে শুধু উলঙ্গ পাপের দৃশ্য
চারিদিকে শুধু কম্পিত হেরি চিত্ত
জ্বলিছে পাপের অনলে আজি এ বিশ্ব।

শৃঙ্খলা হীন হয়েছে এ মহা বিশ্ব
যাহা কিছু ছিল,—সকলি গিয়াছে
ধর্ম্ম হয়েছে নিঃস্ব।

কে বুঝিবে মোর হৃদয়ের ব্যথা
আজি এই দুর্দ্দিনে।
গুমরি গুমরি কত শত ব্যথা
উঠে হৃদয়ের কোণে।

জীবনের আজি করে' দাও প্রভু— অন্ত;
পথের পথিক পথের মাঝারে
হয়েছে অতীব শ্রান্ত।

এক নিমিষেতে লয় কর প্রভু
হয়ে যাক সব শান্ত।

তুমি বিনা মোর কে বুঝিবে
আজি ক্লেশ;
তাই আজি প্রভু ডাকি গো তোমায়
জীবন করিতে শেষ।

তুমি মোর প্রভু হৃদয়ের অন্তর্য্যামী
নির্ম্মল বারি সিঞ্চন কর
অভাগার শিরোপর
মুক্তির লাগি তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়েছি আজি আমি।

শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়— প্রথম শ্রেণী।

শরৎ

আজ শরৎ কালের প্রভাত। বর্ষার গীতি আজ নিস্তব্ধ। গাছের পাতায় বর্ষার অশ্রু, তার উপর শরৎ কালের হাস্য-চপল রৌদ্রের ঝিকিমিকি খেলা —, অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। এত দিন পরে আজ আকাশ-বাতাস আমার পল্লীমায়ের আহ্বান-লিপি ব'য়ে এনেছে আমার দ্বারে। আনন্দের সাথে মানুষের যে একটা নিবিড় ভাব আছে সেটা আজ হঠাৎ যেন প্রাণ পেয়ে উঠে বসেছে। তাই নিস্তব্ধ, বিরাট "হিমালয়" আজ তা'র সাড়া পেয়ে বারে বারে কেঁপে উঠ্‌ছে আনন্দ-ব্যথিত পাখীর ডানার মত। গৌরীর বুক আজ দুরু দুরু, চোখ আনন্দোজ্জ্বল। মর্ত্ত্যমানবেরা তাঁর নিমন্ত্রণ-লিপি প্রকাশিত করেছে।

চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত বেলা। পল্লীমায়ের আঁচলের কোণে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি। দেখি— পিতাভ ধানের ক্ষেত শিশিরসিক্ত মস্তকে দুলিয়া দুলিয়া আগমনী গীতি গাহিতে ব্যস্ত। শারদীয়া পূজার ষষ্ঠী মহোৎসবের দিন আজ। আজ উদ্বোধন। শাস্ত্রের পাতায় নাকি আজ দেবতাদিগের মহা আনন্দের বেলা। প্রতি বাঙ্গালী আজ তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা হৃদয়ের নিগূঢ় ইচ্ছা ৺ দুর্গা প্রতিমার চরণ-কমলে অশ্রুসিক্ত ক'রে পাঠিয়ে দিতেছে। আজ সপ্তমীর পুণ্যময় ক্ষণে সারা গ্রামবাসীর কলধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রপূরিত। কর্ম্ম আজ অলসতার মাঝে মাথা ঝাঁকিয়া উঠিয়াছে। মহাদেবীর মহাদেবালয়ে প্রস্থান, গ্রাম এবং সহরবাসীর আনন্দাকীর্ণ বক্ষে দুঃখের রেখা টেনে দেয়। সংসারের নিয়ম— যেথায় দুঃখ সেথায় সুখ।

শ্রীসুকান্ত দেব— তৃতীয় শ্রেণী।

রাজপুতবীর প্রতাপ

(১)

দাঁড়াইয়া রণভূমে সে প্রতাপ বীর,
বর্ম্মে চর্ম্মে আবরিয়া তনু আপনার।
—ভীমনাদে রণভেরী উঠিল বাজিয়া;
কাঁপাইয়া হলদীঘাট বিস্তৃত প্রান্তর।

(২)

বীরগণ কোষ হ'তে উলঙ্গিয়া অসি,
ঝাঁপায়ে পড়িল সবে শত্রু সেনাপরি।
ক্ষুধাতুর সিংহ ব্যাঘ্র গর্জ্জিয়া যেগতি,
শিকার উপরে ক্রোধে পড়ে হুহুঙ্কারি'।

(৩)

তুরঙ্গ উপরে যুঝে কেহ গজোপরে,
হস্তে অসি, বর্শা ল'য়ে যত যোধগণ।
পদব্রজে যুঝে কেহ করে তীর ধনু;
বিপুল বিক্রমে সবে করিতেছে রণ।

(৪)

রাখিতে চিতোর মাতা বিপুল বিক্রমে;
যুদ্ধ করে রাজপুত কাঁপায়ে মোগল।
দীপ্ত তেজে মোগলেরা যুঝে পরাক্রমে;
বীরগণ রক্তধারে তিতিল ভূতল।

(৫)

হস্ত পদ হীন কেহ করে হাহাকার;
ছিন্ন কলেবর কার' করিছে ক্রন্দন।
দেহ হ'তে মস্তক বিচ্ছেদ হ'ল কার;
পৃথিবী ত্যজিয়া চলে জন্মের মতন।

(৬)

নাসা কর্ণ হীন কেহ দৃশ্য করুণার!
মুমূর্ষুর মৃত্যুদশা আর (ও) শোক গাথা,
কাঁদিছে অস্ফুটস্বরে মৃত্যু যন্ত্রণায়।
বহিছে রক্তের ধারা—নির্ঝরিণী যথা।

(৭)

ছুটিতেছে রণক্ষেত্রে ক্ষিপ্ত অশ্ব গজ,
মুমূর্ষু, আহত কভু করি নিষ্পেষিত।
শত্রু অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে অশ্ব পৃষ্ঠ হ'তে,
কেহ পড়ে বাতাহত কদলীর মত।

(৮)

শৃগাল, কুক্কুর, কাক উৎফুল্ল উল্লাসে।
আসিয়াছে মাংস লোভে শকুনী গৃধিনী।
যোদ্ধৃগণ পরাক্রমে, বধিয়া বিপক্ষগণে,
ঘনে ঘনে উচ্চ কণ্ঠে করে জয়ধ্বনি।

(৯)

আহত ও মুমূর্ষুর কাতর ক্রন্দন,
মাংসাহারী জীবগণ চীৎকারে সতত।
জয়ধ্বনি যোদ্ধাদের। মিশিয়া সকল,
উঠিতেছে রণক্ষেত্রে প্রলয়ের মত।

(১০)

প্রতাপ বীরত্ব দেখি' শঙ্কিত মোগল।
সম্মুখেতে ধাবমান নাশি' বিপক্ষারি
চৌদিকে বিপক্ষসেনা ঘিরিল তাহারে,
শিবাদল মাঝে যথা মৃগেন্দ্র কেশরী।

(১১)

প্রভুর বিপদ দেখি রাজপুত যত ;
করে যুদ্ধ প্রাণপণে হ'য়ে অগ্রসর।
করিল বিপদ শূন্য প্রতাপ সিংহেরে।
আবার ছুটিল বীর বিপক্ষ মাঝার।

(১২)

যুদ্ধ করি বহুক্ষণ—দেখিল চাহিয়া
যুদ্ধক্ষেত্রে, হত যত রাজপুত সেনা।
স্তব্ধ হ'য়ে মুহূর্ত্তেক দেখিল চিন্তিয়া
সমরে উপায় হীন পলায়ন বিনা।

(১৩)

আহত চৈতক শুধু সম্বল তাহার,
—ছুটাইয়া দিল অশ্ব না দেখি উপায়।
বেগবান, বীর্য্যবান, উন্মত্ত সমরে,
ছুটিল শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর আজ্ঞায়।

(১৪)

তবুও বিপক্ষ তার পশ্চাতে পশ্চাতে,
আসিতেছে মহাবেগে অনুসরি' তারে।
তার মধ্যে শক্ত এক—প্রতাপের ভ্রাতা ;
বিপক্ষে ক'রেছে রণ পূর্ব্বেতে সমরে।

(১৫)

কিন্তু এ আবার কি! দেখি বিপরীত,
অব্যর্থ বর্শায় নাশে আকবর সেনা।
চিত্ত বিভ্রম তাহার হইয়াছে বুঝি ;
—প্রতাপ পশ্চাতে ছুটে নাশি সর্ব্বজনা।

(১৬)

শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে ফিরিয়া পশ্চাতে দেখি'
ভ্রাতাকে আপন, উপজিল মহাক্রোধ
প্রতাপ হৃদয়ে। গর্জ্জিয়া কহিল বীর
আঁখি রাঙ্গাইয়া "লব আজি প্রতিশোধ।"

(১৭)

বীর বক্ষ দুরু দুরু উঠিল কাঁপিয়া।
নির্ভয়ে প্রতাপ পদে হইয়া পতিত.
কহে, "দাদা ক্ষম মোর পূর্ব্ব দোষ, দাও
পদধূলি। আজি আমি তব পদাশ্রিত।

(১৮)

উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে চুম্বিয়া আদরে
কহিলা প্রতাপরাজ নেত্র ছল ছল ;
"শক্তে! আজি যুদ্ধে মোর নহে পরাজয়
লভি' তোমা। দুই ভাই আনন্দে বিহ্বল।"

শ্রীবিনোদবিহারী রায়—তৃতীয় শ্রেণী।

GOD.

Whene'er I sleep on my weary bed;
Whene'er I rest under spreading shade;
Who help me always when I seek for help?
I know, I know, He is none but God Himself.

Whene'er I am to go to foreign strand;
Whene'er 'gainst danger I am to stand;
Who guides me always standing by me?
I know, I know, God He must be.

Whene'er Vice tries to tempt my mind,
Whene'er my earthly comrades fall behind;
Who is my truest friend at that perilous time?
It is He whose glory from above doth shine.

Oh Thou! Cast thyself on His mercy alone,
Express thy greetings to Him with the purest tone;
Kneel down and pray with thy folded hands;
"Oh my Father! watch me always and beside me stand.

He will surely hear thy humble prayer,
If thou dost it with thy heart purer;
He is kind and tender to all his sons,
Be pure and true and pray with folded-palms.

Oh my gracious Father! I bow down to Thee,
Pardon my offence and be kind to me;
Thou art kind and good to one and all
That have been sent to this illusive hall

God! Inspire my mind with sentiments of virtue
That I may lead a life peaceful and true;
Father! to Thee I have nothing more to crave
But always from vice my poorself dost save.

Benoybhuson Mukhopadhaya—1st. Class.

গোপালের কীর্ত্তি

বরিশাল জেলার মাহিষ্য দাস নামক এক জন সাধক মহাপুরুষ লাউপালায় বালক দাস নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা সাতু বাবু, নাটু বাবু নামক সাধক জমিদার, খুলনা জেলার অধীন যাত্রাপুরের নিকটবর্ত্তী ভৈরব নদের উত্তর পারে লাউপালা নামক স্থানে যাঁহারা পরিচিত। উক্ত লাউপালায় সাধক মাহিষ্য দাস মহাশয় বালক দাস নামে অভিহিত হয়েন এবং ঈশ্বর গোপাল নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালের নামে এখন পর্য্যন্ত বহু দেশের লোক প্রতি-পালিত হইতেছে। যখন বালক দাস ঈশ্বর গোপালকে লাউপালায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন সাতু বাবু, নাটু বাবু বালক দাসকে বলেন এই জায়গাটুকু আমারা ঈশ্বর গোপালকে দিতে পারি, যদি তোমার গোপাল আমাদের মনের আবেদন পূরণ করিতে পারেন। তাহা হইলে বুঝিব তোমার গোপাল সত্য এবং তুমিও প্রকৃত সেবায়েৎ। বালক দাস তাহাতেই সম্মত হইলেন। এক দিন শীতকালে অনুমান রাত্রি দুই প্রহরের সময় সাতু বাবু, নাটু বাবু বহু লোক সঙ্গে লইয়া লাউপালায় বালক দাস প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপালের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং বালক দাসকে বলিলেন আমাদের খাদ্যাদির বন্দোবস্ত কর। আমাদের ইচ্ছা ভোজন দিতে হইবে। ইলিশ মৎস্য, কচি আমের ঝোল, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ ইত্যাদি দিতে হইবে।

বালক দাস তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং বাবুদের অভ্যর্থনা করিলেন। অসময়ে বাবুদের এইরূপ ফরমাসে বালক দাস কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আহ্লাদের সহিত বালক দাস গোপালের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গোপালকে বলিলেন, গোপাল এখনকার উপায় কর। তুমি ত নিরুপায়ের উপায়, বালক দাসের সহিত গোপালের কথাবার্ত্তা হইত। গোপাল বালক দাসকে বাবা বলিয়া ডাকিতেন। তখন গোপাল বলিলেন বাবা কোন চিন্তা নাই। গোপালের কৃপায় আপনি সব জিনিষ যোগাড় করিতে পারিবেন। ভৈরব নদী গোপালের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। গোপাল বলিলেন বাবা নদীতে যাইয়া দেখ একজন জেলে ভাসাল জাল পাতিয়া আছে, তাহাতে কখনও ইলিশ মাছ বাধে না। গোপালের কৃপায় সেই ভ্যাসাল জালে যথেষ্ট ইলিশ মৎস্য বাধিয়াছে। নদীর ঘাটে একখানা নৌকায় দধি, ক্ষীর, সন্দেশ এবং কলার পাতা সমস্তই বোঝাই আছে। গোপালের মন্দিরের পার্শ্বে একটী আম গাছে এক ডালে কচি আম এবং অন্য ডালে পাঁকা আম আছে। গোপাল বলিলেন বাবা আপনি এই সকল দ্রব্য আনিয়া সকলকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করুন। গোপালের কৃপায় সাতু বাবু, নাটু বাবু অনুমান ১০০ শত লোকসহ আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া, বালক দাস প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহকে অনুমান ৩০০/ বিঘা জমি দান করেন। এই গোপালের কীর্ত্তিকলাপ লাউপালায় এখনও বিরাজিত। এই লাউপালায় রথের সময় প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত মেলা হইয়া থাকে। বহু দেশ হইতে অনেক লোক তথায় আসিয়া আনন্দে যোগদান করেন। ভক্তিভরে ডাকিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, ইহার অনেক উদাহরণ আমরা গোপালের জীবনে পাইয়াছি। ইহা বুঝিয়াও আমরা বুঝি না—জানিয়াও আমরা সন্দিগ্ধমনা—তাই আমরা সংসারে বিপন্ন। কবে আমাদের মোহমদিরা দূর হইয়া আত্মজ্ঞান হইবে এই ভরসায় আমরা ভগবানের দুয়ারে বসিয়া আছি। তাঁহার দয়া কি হইবে না। বালক দাসের ন্যায় যে দিন তিনি আমাদের প্রতি সদয় হইবেন আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। আমাদের আশা পূর্ণ হইবেই।

শ্রীহরিপদ দত্ত,—৫ম শ্রেণী

———

নদী

ছোট্ট চূড়ার গা' বেয়ে কে— চল্‌ছে
ছুটে আপন মনে।
ছড়িয়ে-পড়া-রবির-কিরণ, বুক
ভরে দেয় লহর সনে॥
পাখী সেথায় গান গাহে না,
ফুলের সেথায় নাইক বাস।
চতুর্দ্দিকে নিথর শুধুই, পাহাড় কেবল,
নাইক ত্রাস॥
মস্তকে তার শ্বেত বরণের বরফ
ধোয়া মুকুট পরা।
দৌড়ে বেড়ায় মেঘের সারি ছোট
ছোট ছেলের পারা॥
রাত্রিবেলা তারার মালা মিট্‌মিটিয়ে
দেখে চেয়ে।
মর্ত্ত্যে এ কোন স্বর্গ পুরী, গড়া সে যে।
স্বপ্ন দিয়ে॥
রবির কিরণে সারা দেহ তার,
কাঁপিয়া উঠিল বার বার বার।
গাহিতে লাগিল থেমে-যাওয়া-গান কুলু-
কুলু কুলু রবে।
শিখর হইতে শিখরের পরে,
নাচিয়া আসিল দেখিবার তরে,
পাখীদের বাসা গাছের কোটরে কিরূপেতে
বাঁধা হ'বে॥
ছায়ায় ঢাকা পল্লীমাঝে আস্‌ল ছুটে সে॥
স্নানের তরে যেথায় আসে গ্রামের বধূ রে॥
বালকেরা নদীর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে গো॥
সাঁতার কেটে তীরে এসে বাড়ী ফেরে গো॥
গ্রামের যত বৃদ্ধ মানুষ স্নানের পরেতে॥
নানা প্রকার মন্ত্র পড়ে বাড়ীর পথেতে॥
এখান থেকে চল্‌ল নেচে ক্ষেতের পাশেরে॥
কৃষক যেথায় কর্ম্ম করে ধানের মাঝেরে॥
সাগর মাঝে আপন দেহ মিশিয়ে দিল গো॥
অলস হ'য়ে ঘুমের ঘোরে নিথর হ'ল গো॥

শ্রীসুকান্তকুমার দেব—তৃতীয় শ্রেণী।

লক্ষ্মীছাড়া

(১)

ছোট্ট একটী গ্রাম, তারই পাশ দিয়ে ছোট্ট একটী স্রোতস্বতী বয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষুদ্রা নদীটীর সহিত শৈশবের যে কত স্মৃতি বিজড়িত তা বলে শেষ করা যায় না। গ্রামখানির নাম মনোহরপুর। ছোট্ট গ্রাম হলেও একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। আমাদের বাড়ীর ৫০। ৬০ হাত দূরে ছিল রমেনদের বাড়ী। রমেনের এক বৃদ্ধ পিতা ভিন্ন সংসারে কেউ ছিল না। রমেনের কাজ ছিল স্কুল হইতে পালিয়ে গ্রামভর অত্যাচার করা। গ্রামের ভদ্র গৃহস্থেরা তাকে "লক্ষ্মীছাড়া" উপাধিতে ভূষিত করেছিল। গায়ে তার ছিল অসুরের মত বল আর ছিল পর্ব্বতের ন্যায় অটল প্রতিজ্ঞা। এই দুই কারণেই সে আমাদের দলের সর্দ্দারী করত। এমনি ক'রে খেলা-ধূলায় দিনগুলি বেশ আরামেই যেতে লাগল। একদিন শুনলাম রমেনের পিতার মৃত্যু হয়েছে। তার জমি-জমা ছিল অনেক। প্রতিবেশীরা তাকে ফাঁকি দিয়ে সব কেড়ে নিল। তারা নিতে পারল না শুধু বৃদ্ধের জমান হাজার দু'য়েক টাকা। রমেন এবার স্কুল ছেড়ে দিল। এইভাবে ভাল-মন্দ দিয়ে দিনগুলি কাটতে লাগল।

(২)

পাঠকগণ হয়ত মনে করেছেন যে রমেন পিতার সঞ্চিত অর্থ বাজে কাজে উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু সে তাহা করে নাই। সে তার সঞ্চিত টাকা থেকে একটী পয়সাও অযথা ব্যয় করে নাই। সেদিন ছিল রবিবার। দুপুর বেলা ঘরে বসে পড়া তৈরী করতেছিলাম এমন সময়ে রমেন ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে ছিল একটী সুটকেশ আর একটী কাপড়ের টুপুলি। এসেই একেবারে নবাবের মত হুকুম করল "আমার সাথে আয়।" আপত্তি করতে সাহস হ'ল না। তার সাথে চল্লাম্ সোজা চাষী পল্লীর দিকে। চাষীপাড়ায় ঢুকতে একদল বালক

বালিকা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা সব বল্‌তে লাগ্‌ল "বাবু মোদের জইন্যে কি আন্‌ছেন," কেউ বল্লে "বাবু মোরে একটা ঘোড়া দিইবেন" ইত্যাদি। রমেন তখন কাপড়ের পুঁটুলি খুলে তাদের একটী একটী আম দিলে। রমেনের এই নীচ চাষী লোকের সহিত সংমিশ্রনে তাকে অতি নীচ প্রকৃতি বলে মনে হ'ল। যা হ'ক্ আমরা শেষে একটী জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ কর্‌লাম। সেখানে দেখ্‌লাম একটী রুগ্ন বালক, পার্শ্বে উপবিষ্টা তার বিষণ্ণা মাতা। বালকটীর সমস্ত শরীরে বসন্তের দাগ দেখা যাইতে-ছিল। দেখে আমার শরীর শিহরে উঠ্‌ল। রমেন আমার গায়ে একটা পাতার রস খানিকটা মেড়ে দিল, তারপর বল্লে এর শুশ্রূষা কর্‌তে হবে। তোর কোন ভয় নাই। ঐ পাতার গুণে তোর এ রোগ হবে না। তারপরে সে গেল ডাক্তার ডাক্‌তে। কিছুক্ষণ পরে আমি বাহিরে এসে বস্‌লাম। তখন চাষীরা রমেনের কথা বল্লে। সে তাদের ঘর তৈরীর, জমী ক্রয়ের ঔষধ ও ডাক্তারের টাকা দেয়। আরও কত প্রকারে যে তাদের উপকার করে তা বলা যায় না। ১ ঘণ্টা পরে সে ডাক্তার ও ডাক্তারের ঔষধের বাক্স নিয়ে ফিরলে। তার রাত্রদিন শুশ্রূষার ফলে বালকটী সেরে উঠ্‌ল।

৩

ইহার ৪।৫ দিন পরে শুন্‌লাম রমেনের বসন্ত হয়েছে। তাকে দেখ্‌তে গেলাম। ডাক্তার বল্লে বাঁচ্‌বে না। তার পরদিন তাকে দেখ্‌তে গেলাম। রমেন তার সিন্ধুকের চাবি আমাকে দিয়া বল্ল আমার সিন্ধুকে বাবার সঞ্চিত এক হাজার টাকা আছে এবং তার মধ্যে একখানা উইল আছে। এই উইলে আমি তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছি। তুমি এই টাকা দ্বারা কৃষকদের উন্নতি করবে। তাদের বিপদে পিতার ন্যায় সাহায্য কর্‌বে। সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তারপরেই তাহার আত্মা চলে গেল এক শান্তিময় রাজ্যে।

(৪)

সেই "লক্ষ্মীছাড়ার" আশির্ব্বাদ ও উপদেশ মনে রেখে আমি কৃষকদের সাহায্য করতে লাগ্‌লাম। এখন আমি বুঝ্‌লাম্ সে কত মহৎ, আমি কত নীচ।

অল্পদিনেই চাষীদের সাহায্যে গ্রামটী ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল। কাহারও কোন কষ্ট রইল না। "লক্ষ্মীছাড়ার" আদর্শে গ্রামটী লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্ন হ'ল। ভগবান যেন আমাদের মত শান্ত সুশীল বালক অপেক্ষা এই রকম "লক্ষ্মীছাড়া" বালক বেশী সৃষ্টি করেন। তা হ'লে জগতের অনেক উপকার হ'বে।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ—৩য় শ্রেণী।

আত্ম-বলি

দিল্লীর কারাগারে
ভাবিতে ভাবিতে তেগ বাহাদুর ঘুমায়ে পড়িল ধীরে
স্বপনে দেখিল গুরু
প্রভাতে তাঁহার আমদরবারে বিচার হয়েছে সুরু
কাঁপে বুক দুরু দুরু।
বিচারের ফল "কি হয়, কি হয়,"
ভাবিছে সবার ইহাই হৃদয়
ধীরে—অতি ধীরে বাদশাহ কয়—
"রে কাফের! প্রাণদণ্ড,
মরণের জ্বালা সহ রে এবার ভণ্ড।"
টুটে গেল দুঃস্বপ্ন
ভাবনা-সলিলে হ'ল শিখগুরু মগ্ন।
কোথা নাই কোন সাড়া
সুপ্ত নগরী, সুপ্ত সকলে, সুপ্ত এ মহাধরা।
ভাবিতে লাগিল শিখগুরু আগাগোড়া।

দিব কি আত্মবলি ?
জীবনের তরে বিজাতির করে দিব কি ধর্ম্ম ডালি ?"
বিবেক তখন কহিল তাঁহারে—"দেখ ওরে আখি মেলি।"
শয়তান তাঁরে প্রবোধিয়া কয় ধীরে—,
"বিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিয়া কর্ম্ম করে ;
ধর্ম্মের তরে এ মহাজীবন কেউ কি কখনো ছাড়ে ?"
শুনিল না উপদেশ ;
বারেক কহিল শুধু এই কথা, "আগত জীবন শেষ,"
সময় চলিছে ধীরে
ঐ যায় চলে প্রতি পলে পলে থাকে না কাহারো তরে ;
দিল্লীর কারাগারে
তেমতি গুরুর ভাবনা-প্রবাহ থামে না ক্ষণেক তরে।
অবশেষে গুরু কহিল উচ্চকণ্ঠে—
ধর্ম্মের তরে মরিলে মানব যায় চ'লে বৈকুণ্ঠে
মরিতেই হবে মোর
এ পাপ ধরায় আর না থাকিব, ছেদিব মমতা ডোর
এতেক ভাবিয়া—দেখিল চাহিয়া আগত হয়েছে ভোর।
ম্লান মুখে রবি পূরব গগনে ;
উঠি ধীরে ধীরে চাহে ধরা পানে
পলাইল নিশা রবি দরশনে—
পিছু না ফিরিয়া চায়
দিবা আসি ত্বরা নিশার আসন হাসি মুখে কাড়ি লয়।
জাগিল দিল্লী নগরী
বালকের ন্যায় মহা চীৎকারে উঠিল শয্যা ছাড়ি।
জাগিল অবনী, জাগিল সবাই, জাগিল নগর নগরী।

ভাসিয়া আসিছে অদূরে আজান-ধ্বনি
বড় কমনীয়, বড়ই করুণ, বড়ই মধুর বাণী—
জাগিয়া উঠিল বিশাল ধরণী আজানের ধ্বনি শুনি।
এমন প্রভাতে, এমন লগনে,
কে আছে বসিয়া বিষাদিত মনে ?
কাহারে ঘিরিয়া কঠিন প্রাচীর—
কাহার লাগিয়া অসি প্রহরীর
হাসে সদা খল খল ?
সে বীরের মনে সদা জাগরিত আছে কি ধর্ম্মবল।
খুলে গেল কারাদ্বার—
প্রবেশিল সেথা ভীষণ মূরতি প্রহরীরা বারবার—
কাহারো হস্তে দীর্ঘ কৃপাণ—
রণরঙ্গে মাতি অরিরে কাটিতে চাহে করি খান খান।
কাহারো হস্তে সুধার কুঠার—
বন্দীর শির ছেদিতে বুঝি বা জনম হইল তার
সারি দিয়া সবে দাঁড়াইল আসি কক্ষে—
ভীষণ মূরতি হেরিয়া বারেক কম্পন হ'ল বক্ষে।
কহে বীর ধীর ভাবে
"মরণের দ্বারে এখনই কি মোর সশরীরে যেতে হবে ?"
"নিশ্চয়ই" বলি বাঁধিল তাঁহারে সবে।
কহে গুরু পুনরায়
দাঁড়াও, দাঁড়াও, মোগলের চর, ছুঁয়ো না পুণ্য কায় ;
শুনিল না কেহ হায় !
ক্রোধেতে ফুলিল শিখ
শিখের শোণিত জ্বলিয়া উঠিল কাঁপিছে চতুর্দ্দিক।

শৃঙ্খলে বাঁধা হাত
কাঁপিতে লাগিল ক্রোধে শিখগুরু যেন কদলির পাত।
কিছু না কহিল বাণী,
মোগলের চর চলিল তাঁহারে সঙ্গে লইয়া টানি।
শিরশ্ছেদ অনিবার্য্য—
অমনি গুরুর ফিরিয়া আসিল সুপ্ত পূর্ব্ব বীর্য্য।
সবল চরণঘাতে
প্রহারিল গুরু মোগলের বাম হাতে।
গরজি উঠিল চর
গালাগালি করে যত আসে মুখে, দাঁত করে কড়মড়।
প্রহারিল পুনঃ বক্ষে
লুটিয়া পড়িল মোগলের চর কঠিন সে কারাকক্ষে
ধরে তাঁরে সবে মিলি
কেহ মারে কীল, কেহ মারে চড়, কেহ করে গালাগালি
আমদরবারে আজি
হাজার হাজার ওমরাহগণ, উজির, নাজির, কাজি
সমাসীন সবে সাজি।
অদূরে উচ্চ স্থানে
ভারতের প্রভু কুটিল প্রধান বসেছে স্বর্ণাসনে
কুটিলতা তাঁর খেলিছে দীপ্ত বদনে।
মরি মরি কিবা সভা
মুকুতা, হীরকে দীপ্ত কক্ষ, ভূতলে অতুল শোভা
দেবতার মনোলোভা।
আসিল বন্দী ধীরে
দাঁড়াইল সেথা হরষিত চিতে দীপ্ত উচ্চ শিরে।

কথা নাই দরবারে।
উজির আসন ছাড়ি
কুর্নিশ করি বাদশাহ প্রতি বুলায়ে শুভ্র দাড়ি
কহে হাত মুখ নাড়ি।
আরবী, পারসী আরো কত ভাষা—
কার সাধ্য বুঝে। ডাকে যেন মশা;
বুঝিবারে তাহা ত্যজ সবে আশা—
আর না করিও ইচ্ছা—
মাঝে মাঝে কেহ সভায় মাঝারে কহিছে, "বহুৎ আচ্ছা।"
উঠিল আর এক দাড়ি
কুর্নিশ করি হেসে হেসে কয়, "এতদূর বাড়াবাড়ি
কাফেরের তেজে ভারতবর্ষ কাঁপে যেন থরথরি।"
করে সে শাস্ত্র বিচার
চমৎকার তাহা অতি চমৎকার জলবৎ পরিস্কার—।
"ইস্‌লাম ধর্ম্ম সার—"
মৌলবী সাহেব তাহাই সভায় কহিছেন বারবার
কাফেরের শাস্ত্রভুল
যেমন কাফের তেমনি শাস্ত্র আকারেতে মহা স্থূল।
বসিল আসনে পুনঃ
কাফেরের দোষ কেহ বা কহিছে বাড়াইয়া দশগুণ।
আর নাহি কোন কথা—
মোগলেরা হাসি চাহে গুরু পানে হিঁদুরা পাইছে ব্যথা
বাদশাহ কহে তবে
"বাঁচিতে বাসনা আছে কি হৃদয়ে আর কিছুদিন ভবে?
ধর্ম্মের বিনিময়ে

সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার, হেসে খেলে থাক শুয়ে
মিছামিছি কেন বাপু
হারাবে অকালে ধর্ম্মের তরে এমন বিশাল বপু ?
মৃদু হাসি গুরু কয়—
"অরে রে মূর্খ ! এমন বচন বলিবার যোগ্য নয়
বর্ব্বর সনে বাস করি তোর হয়েছে এ দশা হায় !"
ছুটিল নয়নে অগ্নি—
ঘৃতের পরশে অগ্নিকুণ্ডে জ্বলিয়া উঠিল বহ্নি।
ওমরাহ কহে "চুপ"
"জগৎপূজ্য মহামাননীয় ভারতের ইনি ভূপ।"
গুরু কহে ক্রোধমনে
"থাম বাছাগণ! খোসামোদ কর্ তোরা ঐ শয়তানে'
এত বলি গুরু চাহিল বারেক আলমগীরের পানে।
বাদশাহ কহে "কি !"
"আমার প্রতি এতেক আচার, এত বড় গোস্তাকি !"
কথা নাহি সরে মুখে
সভাসদ সবে ভাবিল প্রমাদ, বসে র'ল অধোমুখে।
অগ্নিগোলক প্রায়—
আলমগীরের নয়ন হইতে বহ্নি ছুটিয়া যায়।
কাঁপে দীর্ঘ কলেবর—
কাঁপে বসুন্ধরা, কাঁপে দরবার, কাঁপে সবে থরথর।
কুঞ্চিল কুটিল ভ্রূ
কোথা নাই সাড়া, বাদসাহ শুধু মুখেতে বলিল, "হুঁ"
বাদশাহ কাঁপি কয়—
"ক্ষমিনু এবার সব অপরাধ ত্যজ মরণের ভয়।"

সবাই বুঝিল এমন আচার কখনই শুভ নয়।
তুলিয়া উচ্চ শির—
গম্ভীর নাদে উচ্চ কণ্ঠে কহিছেন শিখবীর—
"যে দিন হয়েছি বন্দী—
জীবনের আশা ছেড়েছি সে দিন, কত বা করিবে ফন্দী।
আরে রে শাহানশাহ
নিজধর্ম্মে থাকি মরণেও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।
কুটিল প্রধান তুমি
ভ্রাতৃঘাতী খল শিরোমণি, পূজিব না তোরে আমি।
লম্ফ প্রদান করি
বাদশাহ উঠি গরজি কহিল, "এতদূর বাড়াবাড়ি ?"
হত্যা ! হত্যা ! হত্যা !
মস্তক ছেদি নগর মাঝারে প্রচারিবে এই বার্ত্তা—
নিয়ে যা ঘাতকগণ
তপ্ত তরল রুধির বিনা শান্ত হবে মন।
সভা হ'য়ে গেল ভঙ্গ
কেহ বা চলিল নিজেব আলয়ে, কেহবা দেখিতে রঙ্গ।
মশানে লোক না ধরে—
কেহ বা নাচিছে, কেহ বা গাহিছে, কেহ কাঁদে বারে বারে।
আসিল বধ্য স্থানে
ঘাতকের সহ তেগবাহাদুর অতি হরষিত মনে।
শিখেরা কহিল "জয়"
তেগবাহাদুর উচ্চকণ্ঠে সকলে শুনায়ে কয়—
"বন্ধু হিন্দুগণ !
ক্ষোভ না রাখিও হৃদয় মাঝারে, লৌহে বাঁধো হে মন

ধর্ম্ম নাহিগো দিবে
জীবনের তরে এমন ধরম কদাপি ভাই না ছাড়িবে।
শপথ করোগো সবে।
দিল্লীর বাদশারে—
থাকিতে দিবে না শান্তিতে এক নিমিষের তরে।
কহিতে না দিল কথা
সুধার কুঠার উঠায়ে ঘাতক কাটিয়া ফেলিল মাথা
রুধির বহিয়া যায়—
নিস্পলক চোখে ছেদিত মুণ্ড রুধির দেখিছে হায়!
কাঁদিল না শিখদল
প্রস্তরবৎ সবাই দাঁড়ায়ে রহিল যেমতি কল।
তারপর! আরও শুনিতে চাও?
প্রয়োজন নাই নিঠুর দৃশ্যে এখানে ক্ষান্ত হও।
রহিল ভূতলে শির—
ধর্ম্মের মান রাখিল গুরুর তরল তপ্ত রুধির
শত্রু মিত্র সবার নয়নে বহিতে লাগিল নীর।
এমন আত্মবলি
কেউ কি কোথায় দিয়াছে জগতে সমুদয় সুখ ভুলি
আর নাহি কিছু বাকী—
সেই দিন হতে জাগিল না গুরু আর না মেলিল আঁখি।

শ্রীবিনয় ভূষণ মুখোপাধ্যায়—প্রথম শ্রেণী।

ভা

বহুদিন পূর্ব্বের কথা—মনোহরপুর নামক গ্রামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু ঘোষ পরিবার ছিল। এই পরিবারের কর্ত্তা হরেন ঘোষ। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম সুনীল কুমার ঘোষ। সুনীল বাবু ঐ গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাঁহার বাৎসরিক আয় ৪০ হাজার টাকা। গ্রামের অধিকাংশ লোক তাঁহাকে ভালবাসিত। কেন না তিনি পরদুঃখে কাতর ছিলেন। প্রজাদিগকে নিজের পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। আর কতকগুলি লোক তাঁহাকে দেখিয়া হিংসা করিত, কেন না তিনি জমিদার। সুনীলের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলের অষ্টাদশ বৎসর এবং কনিষ্ঠ পুত্র অবনীর দ্বাদশ বৎসর বয়স। অনিল তখন কলিকাতায় প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। কিন্তু তাহার ভাগ্যে আর পড়া হইল না। একদিন সন্ধ্যাকালে সুনীল বাবু সকলকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

অনিল এখন সংসারের কর্ত্তা। অবনী তখনও পড়িতেছে, ইহাদের মধ্যে কোন দিন কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটে নাই। অবনী বি, এ, পাস করিয়া আসিয়া দুই ভাইতে মিলিয়া কাজ করিতে লাগিল।

অবনীর কতকগুলি কু-সঙ্গী জুটিল। তাহারা তাহাকে কিরূপে অনিলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। একদিন তাহারা মনে করিল যে দেশভ্রমণে বাহির হইবে এবং সমস্ত খরচ অবনী দিবে। তার পরদিন অবনী তাহার দাদার নিকট গিয়া বলিল "আমাকে ২০০৲ টাকা দাও।" তাহার দাদা বলিলেন যে পরে দিবেন। সে তাহাই তাহার সঙ্গীগণকে বলিল, সঙ্গীগণ বলিল, "দেখ, আমরা কি তোমাকে এতদিন মিথ্যা কথা বলিয়াছি, সম্পত্তিতে তোমার যে অধিকার তোমার দাদারও সেই অধিকার। তোমার দরকারের সময় তোমাকে দিল না। ইহার পর তোমাকে কিছুই দিবে না"। অবনী বলিল এখন টাকা নাই। পরে দিবেন। তাহারা বলিল আচ্ছা দেখা যাবে।

এই ঘটনার চার মাস পরে। কুসঙ্গীগণ বলিল এইবার টাকা চাও। অবনী তাহার দাদার নিকট আবার টাকা চাহিল কিন্তু তাহার দাদা বলিলেন আর ১০।১২ দিন দেরী কর। অবনীর তখন কুসঙ্গীগণের কথা মনে পড়িল। সে বলিল তাহা হইলে সম্পত্তি আমাকে ভাগ করিয়া দাও। অনিল বাবু সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া নিজের অংশ বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

এ দিকে গ্রামবাসীরা অবনীর সঙ্গে কেহ আলাপ করিত না, এবং তাহাকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছে। অবনীর খুব কষ্টে দিন যাইতেছে।

একদিন সে তাহার বড় ভ্রাতৃবধূর পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, "তোমার দাদার খুব অসুখ, শীঘ্র আসিয়া জ্যেষ্ঠকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।"

অবনী সকল অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। সে গিয়া দেখিল যে তাহার ভ্রাতা মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। সে তখন তাহার পাশে গিয়া বসিল। অনিল তাহাকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। দুই জনে এইরূপে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। সেই সময়ে পাশের বাড়ীর একজন লোক গান ধরিল।

"এমন ঘরের হ'য়ে পরের মতন,
ভাই ছেড়ে ভ'াই কদিন থাকে"

শ্রীহীরালাল ঘোষ—তৃতীয় শ্রেণী।

আফগানিস্থানের সংক্ষিপ্ত আধুনিক ইতিহাস

বালকগণ, তোমরা আমাদের দেশে আলখেল্লা পরা লম্বা লম্বা লাঠিধারী নাগরা জুতা পায় দেওয়া মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ীওয়ালা একদল ব্যবসায়ীকে দেখিয়াছ। পূর্ব্বে ইহারা এ দেশে শীতকালের প্রারম্ভে আসিত; পৃষ্ঠে বড় বড় সস্তা দামের

গায়ের কাপড়ের মোট থাকিত। কৃষক পল্লীতে ঘুরিয়া চৈত্র মাস ওয়াদা করিয়া আমাদের সরল বিশ্বাসী কৃষকগণের নিকট ৩৲। ৪৲ টাকার বিদেশী গায়ের কাপড় ৭৲। ৮৲ এমন কি ১০৲। ১২৲ টাকায় বাকীতে বিক্রয় করিত। আমাদের দেশের কৃষকগণ বাকী পাইলে ১৲ এক টাকার জিনিষ ৫৲ পাঁচ টাকায় কিনিতে কখনও পশ্চাৎপদ নহে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন তাহারা ধান্য উঠানে আনে তখন ঐ ধান্য বিক্রয় করিয়া ব্যয় করিতে তাহারা মোটেই ইতস্ততঃ করে না। এই কাপড়ের দাম এই ব্যবসায়ীগণ ঐ সময় কৃষকগণের নিকট হইতে সহজে আদায় করিয়া দেশে চলিয়া যাইত। যাহারা এ দেশে থাকিত তাহারা টাকা কর্জ্জ দিবার ব্যবসায় চালাইত। ভারতের শুভক্ষণে যখন স্বদেশী যুগ ভারতে দেখা দিল দেশীয় জিনিসের প্রতি যখন দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল—তখন ইহারা শীত কাপড়ের ব্যবসায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তখন ইহারা ইংরাজ নাট্যকার সেক্ষপিয়রের কুসিদজীবী সাইলকের ব্যবসায় জোরে আরম্ভ করিয়া দিল বর্ত্তমানে উহারা উহাদের পূর্ব্ব ব্যবসায় প্রায় ত্যাগ করিয়াছে এবং মাসিক ফি টাকায় ৵০ হিসাবে সুদ আদায় করিয়া টাকা কর্জ্জের ব্যবসায় চালাইতেছে। অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক উহাদের কবলে আবদ্ধ। মাসিক সুদ আদায় করিতে ইহারা সিদ্ধহস্ত। ইহারা জানে যে কোন প্রকারে ৯।১০ মাস সুদ আদায় করিতে পারিলে ইহাদের সুদ আসল সমস্ত টাকা শোধ হইয়া যাইবে। এই বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাড়ী কোথায় তাহা বোধহয় তোমরা সকলেই জান। ইহারা যে স্বাধীন দেশে বাস করে তাহা তোমরা ইহাদের ব্যবহার দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের খাইবার, গোমাল বা কুরাম গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ইহাদের অধিকাংশই আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আইসে। এই দেশের রাজধানী কাবুল এই জন্যই ইহারা কাবুলি বলিয়া আমাদের দেশে পরিচিত। এই ক্ষুদ্র রাজ্য কি ভাবে বহুদিন হইতে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, তাহার ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমাদের জানা কর্ত্তব্য তাই আজ তোমাদিগকে ইহা শুনাইব। স্বাধীনতার ইতিহাস পড়িলে তোমাদের স্বদেশ-প্রেম আরও জাগিয়া উঠিবে; তোমরা দেশের

মঙ্গলের জন্য সাধনা করিবে—এই জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। আশাকরি তোমরা মনোযোগ সহকারে এই ক্ষুদ্র সত্য গল্প পড়িবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্বাধীন দেশের রাজা ছিলেন আহম্মদ সাহ আবদালি বা ডুরানি। ইনি পূর্ব্বে পারস্য ও আফগানিস্থানের দস্যু রাজা ভারত-বিজয়ী নাদির সাহের অধীনে সেনানীর কার্য্য করিতেন। নাদির তাঁহার পারসিক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিহত হন। এই সুযোগে এই শক্তিশালী কূটবুদ্ধি সেনাপতি আফগানিস্থানের কান্দাহার প্রদেশে আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং ক্রমে প্রবল শক্তিশালী রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক হয়। তিনি রাজ্য বিস্তার ও স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন জন্য ধনরত্নের ভাণ্ডার—ভারতবর্ষ চারিবার আক্রমণ করেন। প্রথমবার শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত তিনি দখল করেন। যদি তিনি সেবার সম্রাটপুত্র শাহজাদা আমেদ কর্ত্তৃক পরাজিত না হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই নাদিরের ন্যায় দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া বসিতেন। কিন্তু তিনি সেবার পরাজিত হইয়া দেশে ফিরিলেও সুজলা সুফলা ভারতের প্রতি তাঁহার লোলুপদৃষ্টি রহিল। এই ঘটনা ১৭৪৮ সালে সংঘটিত হয়। ৩ বৎসর শেষ হইতে না হইতেই তিনি পুনরায় প্রবল পরাক্রমে সসৈন্যে ভারত আক্রমণ করেন এবং দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট আমেদ শাহ তাঁহাকে পঞ্জাব প্রদেশ দিতে বাধ্য হন। তদবধি পঞ্জাব আফগানরাজ আহম্মদ সাহের অধিকারভুক্ত হয়। ইতিমধ্যে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের নিজাম আসফজার পুত্র গাজীউদ্দীন উজীর হইয়া দিল্লীতে আসেন এবং সম্রাটের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। তিনি তাঁহার প্রভু দিল্লীর সম্রাটকে সিংহাসন-চ্যুত ও অন্ধ করিয়া ভূতপূর্ব্ব সম্রাট জাহন্দর শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলমগীরকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই উজীর সাহেবের নিকট দিল্লীর সম্রাটগণ ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ ছিলেন; উজীর গাজী উদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আহম্মদ শাহের অধিকৃত পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর অধিকার করেন। ইহাতে আহম্মদ শাহ আবদালি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং সেবার কেবল পঞ্জাব অধিকার করিয়া ফেরেন নাই। তিনি দিল্লী ও মথুরা আক্রমণ করিয়া উভয় স্থানের অধিবাসীগণের রক্তে

রাজধানী ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ভাসাইয়া দিলেন। ভগবান এতদূর অত্যাচার সহ্য করিলেন না। তাঁহার আক্রোশ আহম্মদ শাহের সৈন্যগণের উপর রোগ ও মহামারী-রূপে দেখা দিল সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিতে হইল। তিনি দেশে ফিরিবার সময় তাঁহার পুত্র তৈমুরকে পঞ্জাবের শাসন জন্য রাজ প্রতিনিধি রাখিয়া যান।

এমন সময় দাক্ষিণাত্যে শিবাজী প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মারাঠা শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়া ছিল। তাহারা সমস্ত দাক্ষিণাত্য ও রাজপুতনা দখল করিয়া লইয়াছিল। দুর্বল সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য উজীর গাজীউদ্দীন মারাঠাদিগের সাহায্য চাহিয়া পাঠান। তখন পেশোয়ার শ্রেষ্ঠ বাজীরাওয়ের পুত্র বালাজি বাজীরাও মারাঠা শক্তির কর্ণধার। তিনি তাঁহার ভ্রাতা রাঘবকে দিল্লীর সম্রাটের সাহায্য জন্য সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করেন। ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত। রাঘব কেবল দিল্লী দখল করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আফগান রাজ আহম্মদ সাহের পুত্র ও পঞ্জাবের রাজ প্রতিনিধি তৈমুরকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ভারতবাসী মনে করিল শিবাজীর কল্পনা বুঝি এইবার বাস্তবে পরিণত হইবে। কিন্তু ভগবানের বিধান কেহই বুঝিতে পারে না, তিনি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তৈমুরকে মারাঠা সেনাপতি রাঘব পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করায় আহম্মদ সাহ সসৈন্যে আসিয়া ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদিগকে পরাজিত ও ধ্বংস করেন। এই যুদ্ধে মারাঠাদের যে কত প্রধান প্রধান যোদ্ধা নিহত হন তাহা শুনিলে তোমরা স্তম্ভিত হইবে। এই মহাযুদ্ধের ফলে মারাঠাদিগের ভারতে হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আশা সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়। তৈমুরের পর তাঁহার পুত্র জামাল শাহ পঞ্জাবের শাসন ভার, পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের উপর ন্যস্ত করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জামাল শাহ সিংহাসন চ্যুত হইল, পঞ্জাবে রণজিৎ স্বাধীন হন। জামাল শাহের সিংহাসনচ্যুতির পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ সুজা আফগানিস্থানের সিংহাসন অধিকার করেন। পঞ্জাব তদবধি স্বাধীন ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় চৌধুরী।

Editorial.

We owe our readers an apology for our delay in publishing the third issue of our magazine. It could not be published in time through unavoidable circumstances. For the sake of convenience the third and the fourth issues are now publislhed together.

Teaching staff—

Asst. Teacher Babu Anukulchandra Mukerjee B. A. has been granted leave upto 31st. December, 1930 and the temporary vacancy has been filled up by the appointment of an experienced graduate Babu Basantakumar Bhattacharyya.

Results of Sanskrit Examination, 1930—

Our Head Pandit Bhupendranath Kavyatirtha has a Sanskrit Tol from which the following 5 boys of our school passed the Sanskrit First and Second Examinations in Vyakaran (Mugdhabodha) in the second division in 1930.

1. Sachindranath Bose —Second Examination
2. Haripada Halder First ,,
3. Ramratan Basu ,, ,,
4. Nirmal krishna Pramanik ,, ,,
5. Jnanendranath Ray ,, ,,

Text Books—

The Director of public Instruction has published a list of books approved by the Text Book committee for introduction in all the Government and Government aided schools of Bengal. Hitherto the school authorities have

tried their best not to change any book in any class when it is found suitable and fit. We are, however, afraid that considerable alterations will have to be made this year in the selection of text books, although we should have been very glad to avoid them, anxious as we are to relieve the poor guardians at this time of dire economic distress.

Teaching through vernacular—

The D. P. I. of Bengal in his circular letter No. 4. T. B. of 23. 10. 30 informs that in the first four classes of High English schools the instruction and examinaion in all subjects shall be conducted either in English or in the Vernacular and in classes below the fourth, the instruction and examination in all subjects shall be conducted in the Vernacular only. We do not know if the Calcutta University will accept the proposal of the D. P. I. and allow the Matriculation Examination to be con ducted as proposed. The school authorities will try to introduce instruction and examination in all subjects in the Vernacular in all the classes.

Games--

It is satisfactory to note that our boys have at length given up their old predilection for foot-ball and cricket and begun to evince a real interest in indigenous games like Hadu dudu. There is no denying the fact that football, cricket and other games are not at all suitable for our climate. Moreover, they are too costly for poormen like us and pooduce the most undesirable effect in not a few cases. Hadu dudu, deracota and other old-fashioned games of our country have nothing of those objectionable features and besides, being very simple and less costly, are as interesting as good for body and mind. With the advent of Western

rule in India, the people of this country adopted not only the habits and customs of their foreign masters but also gave up their own simple and costless games in which even the grown-up young men tried to excel. In all village festivals, the exhibition of physical courage formed a prominent part, but, alas! the old fashion gave place to new and we were habituated to imitate our western rulers in all their doings without considering the consequences thereof. However, we whole-heartedly welcome this new spirit and change of outlook among our boys and young men and pray to the almighty that He may make them steady in their thought and deed. In this connection we make it known to our readers that the athletic department intends to award two medals in Hadu dudu contests and that several gymnastic apparatus including one adjustable Barbell, discs weighing about 2 mds, have been recently purchased for the boys.

Free compulsory primary Education—

The long expected free compulsory Education Bill for Bengal has been passed. We come to know that a few experimental schools of the type will be started at an early date in the district of Khulna. The Government have asked the District Inspector of schools to select sites and to make other necessary arrangement for starting them. We wait to see how they are liked by the people who shall have to pay an additional tax for the upkeep of these schools.

